রাজদ্রোহী

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচিপত্র

1..2

2..26

3..66

4..86

5..104

6..116

7..129

8..178

1

ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তে আরব সাগরের উপকূলে কাথিয়াবাড় প্রদেশ, যেখানে বিশ্ববরেণ্য মহাপুরুষ– অহিংসার পূর্ণাবতার– জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে সেখানে অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্য ছিল। ছোট ছোট রাজারা সাবেক পদ্ধতিতে রাজ্য ভোগ করিতেন। তাঁহারা আমোদ-প্রমোদে মগ্ন থাকিতেন; পাত্রমিত্র সচিবেরা নিজেদের লাভের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শাসনতন্ত্র নিয়ন্ত্রিত করিতেন; মহাজনেরা অর্থ শোষণ করিতেন।

গিরি-প্রান্তর বিচিত্র দেশ। পিছনে শুষ্ক নগ্ন গিরিমালা, সম্মুখে মরুভূমির মত পাদপ-বিরল শিলা বন্ধুর ভূমি তাহার ভিতর দিয়া অসমতল কুটিল পথের রেখা। এই দেশ আমাদের কাহিনীর রঙ্গভূমি। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেও এই দেশে এক জাতীয় বীর দস্যুর আবির্ভাব হইত যাহাদের রবিন হুডের সঙ্গে তুলনা করা যায়। দেশের লোক তাহাদের বলিত– বারবটিয়া!

যুগে যুগে দেশে দেশে প্রবলের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে দুর্বলের মনুষ্যত্ব বিদ্রোহ করিয়াছে; এই বীর দস্যুরা সেই বিদ্রোহের জীবন্ত বিগ্রহ। যখনই ধর্মের গ্লানি হইয়াছে, অন্যায়ের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে তখনই ইহারা আর্তের পরিত্রাণের জন্য আমাদের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আপাতদৃষ্টিতে ইহাদের সমাজদ্রোহী বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু যুগে যুগে ইহারাই সমাজকে রক্ষা করিয়াছেন, ন্যায়ের শাসন প্রবর্তন করিয়াছেন। কখনও দস্যুর বেশে, কখনও দিগ্বিজয়ীর বেশে, কখনও কৌপীনধারী সন্ন্যাসীর বেশে।

.

নিকটতম নগর হইতে প্রায় ক্রোশ তিনেক দূরে যেখানে সমতল ভূমি শেষ হইয়া পাহাড়ের চড়াই শুরু হইয়াছে, সেইখানে নির্জন গিরিপথের পাশে ক্ষুদ্র একটি প্রপা বা জলসত্র। জলসঙ্কটপূর্ণ মরুদেশের ইহা একটি বিশেষ অঙ্গ, সর্বত্র পথের ধারে দুই তিন ক্রোশ অন্তর একটি করিয়া প্রপার ব্যবস্থা আছে; ইহা রাজকীয় ব্যবস্থা, আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে। দেশের লোক ইহাকে বলে পরপ। সংস্কৃত প্রপা শব্দটি এই অপভ্রংশের মধ্যে এখনও বাঁচিয়া আছে। প্রতি প্রপার একটি করিয়া প্রপাপালিকা রমণী থাকে; পিপাসার্ত পথিক ক্ষণেক দাড়াইয়া জলপান করিয়া আবার গন্তব্য পথে চলিয়া যায়।

জলসত্র গৃহটি অতি ক্ষুদ্র; অসংস্কৃত-পাথরের টুকরা দিয়া নির্মিত একটি ছোট ঘর, সম্মুখে একটুখানি বারান্দা। বারান্দায় সারি সারি জলের কুম্ভ সাজানো আছে। চারিদিকে জংলী ঝোপঝাড়, পাথরের চাঙড়া; অন্য কোনও লোকালয় নাই। পিছনে পোয়াটাক পথ দূরে পার্বত্য ঝরনার জল জমিয়া একটি জলাশয় তৈয়ার হইয়াছে, সেই সরোবর হইতে জল আনিয়া প্রপাপালিকা জলসত্রে সঞ্চয় করিয়া রাখে।

এই সত্রের প্রপাপালিকাটি বয়সে যুবতী; তাহার নাম চিন্তা। সে দেখিতে অতিশয় সুশ্রী, কিন্তু তাহার সুকুমার মুখখানি সর্বদাই যেন ম্লান ছায়ায় আচ্ছন্ন বলিয়া মনে হয়। একদিন অপরাহ্নে সে বারান্দার কিনারায় বসিয়া টাকুতে সুতা কাটিতেছিল আর উদাসকণ্ঠে গান

গাহিতেছিল। এ পথে অধিক পান্থের যাতায়াত নাই, তাই চিন্তা অধিকাংশ সময় তকলি কাটিয়া ও গান গাহিয়া কাটায়। সঙ্গীহীন প্রপায় আর কিছু করিবার নাই। যে তরুণ শিকারীটি মাঝে মাঝে অকস্মাৎ দেখা দিয়া তাহার প্রাণে বসন্তের হাওয়া বহাইয়া দিয়া যায় সে আজ আসিবে কিনা চিন্তা জানে না, তবু তাহার চোখ দুটি থাকিয়া থাকিয়া পথের এ-প্রান্ত ও-প্রান্ত অন্বেষণ করিয়া আসিতেছে, কান দুটিও একটি পরিচিত অশ্বক্ষুরধ্বনির জন্য সতর্ক হইয়া আছে।–

দরশ বিনে মোর নয়ন দুখায়
দূর পথের পানে চেয়ে থাকি
কভু ঝরে আঁখি, কভু শুকায়।
বুকের আঁধারে প্রদীপ-শিখা
কাঁপে আশার বায়ে
রহি শ্রবণ পাতি
ঐ নূপুর বাজে বুঝি রাঙা পায়ে
মরি হায় রে!
কোন বৈরাগী খঞ্জনি বাজায়ে যায় রে
মোর আশার দামিনী মেঘে লুকায়।

গানে বাধা পড়িল। পথের যে-প্রান্তটা পাহাড়ের দিকে উঠিয়াছে সেই দিকে হুমহুম শব্দ শুনিয়া চিন্তা চাহিয়া দেখিল, একটি ডুলি নামিয়া আসিতেছে। সামনে পিছনে তিনজন করিয়া বাহক, দুই পাশে দুইজন বল্লমধারী রক্ষী। ডুলি জলসত্রের সম্মুখে পৌঁছিতেই

ডুলির ভিতর হইতে তীক্ষ্ণ রমণীসুলভ কণ্ঠের আওয়াজ বাহির হইল ওরে, থামা থামা— এটা পরপ না?

বাহকেরা তৎক্ষণাৎ ডুলি নামাইল। ডুলির মুখ রৌদ্র ও ধূলি নিবারণের জন্য পদ দিয়া ঢাকা ছিল। এখন পর্দা সরাইয়া যিনি মুখ বাহির করিলেন, তিনি কিন্তু রমণী নয়, পুরুষ। প্রৌঢ় শেঠ গোকুলদাসের কণ্ঠস্বর রমণীর মত এবং চেহারা মর্কটের মত, কিন্তু দেশসুদ্ধ লোক তাঁহাকে ভয় করিত। দেশে সুদখোর মহাজনের অভাব ছিল না কিন্তু এই গোকুলদাসের মত এমন বিবেকহীন হৃদয়হীন সাহুকার আর দ্বিতীয় ছিল কিনা সন্দেহ।

ঘটনাচক্রে চিন্তা গোকুলদাসকে চিনিত, তাই তাঁহাকে দেখিয়া তাহার মুখ কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। গোকুলদাস তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,-

ওরে ঐ! পটের বিবির মত বসে আছিস চোখে দেখতে পাস না? জল নিয়ে আয়।

চিন্তা কোনও ত্বরা দেখাইল না, ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া একটি লম্বা আকৃতির ঘটিতে জল ভরিয়া ডুলির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

গোকুলদাস গলা বাড়াইয়া নিজের দক্ষিণ করতল মুখের কাছে অঞ্জলি করিয়া ধরিলেন, চিন্তা তাহাতে জল ঢালিয়া দিতে লাগিল। জল পান করিতে করিতে গোকুলদাস চক্ষু বাঁকাইয়া কয়েকবার চিন্তাকে দেখিলেন, তারপর জলপান শেষ হইলে মুখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন,

আরে এ মেয়েটা চেনা চেনা মনে হচ্ছে। বীর গ্রামের সেই রাজপুতটার মেয়ে না?

ডুলির এ-পাশে যে বল্লমধারী রক্ষীটা দাঁড়াইয়া ছিল তাহার নাম কান্তিলাল; সে এতক্ষণ নির্লজ্জ লেলিহ চক্ষু দিয়া চিন্তার রূপ-যৌবন নিরীক্ষণ করিতেছিল, এখন প্রভুর প্রশ্নে গোঁফে একটা মোচড় দিয়া বলিল,-

হাঁ শেঠ, চৈৎ সিংয়ের মেয়েই বটে। দেখছে না মুখখানা হাঁড়িপানা করে রয়েছে একটু হাসছেও না।

গুজরাত কাথিয়াবাড়ে আপনি বলিবার রীতি নাই— সকলে সকলকে নির্বিচারে তুমি বা তুই বলে।

ভৃত্যের এই রসিকতায় গোকুলদাস কৃষ্ণ-দন্ত বাহির করিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে বসিলেন—

হি হি হি-তুই চৈৎ সিংয়ের মেয়ে! শেষে পরপে কাজ করছিস?

চিন্তার চোখে ধিকি ধিকি আগুন জ্বলিতে লাগিল। সে চাপা স্বরে বলিল, হ্যাঁ। দেনার দায়ে তুমি আমার বাবার যথাসর্বস্ব নিলেম করে নিয়েছিলে, সেই অপমানে বাবা মারা গেলেন। তাই আজ আমি জলসত্রের দাসী।

গোকুলদাস বলিলেন, তোর বাপ টাকা ধার নিয়েছিল কেন? আর এতই যদি মানী লোক, তোকে বিক্রি করে আমার টাকা ফেলে দিলেই পারত। তাহলে তো আর তোকে দাসীবৃত্তি করতে হত না।

কান্তিলাল রসান দিয়া বলিল,-দাসীবৃত্তি! রানীর হালে থাকত শেঠজী। খরিদ্দার ওকে মাথায় করে রাখত।

চিন্তা তাহার দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, কিন্তু পরপওয়ালীর অগ্নিদৃষ্টি কে গ্রাহ্য করে? কান্তিলাল গোঁফে চাড়া দিতে দিতে কদর্য ভঙ্গিতে হাসিতে লাগিল। চিন্তা আর কোনও কথা না। বলিয়া নিবিড় ঘৃণাভরে ফিরিয়া চলিল।

ডুলির বাহকেরা এতক্ষণ ঘর্মাক্ত-দেহে দাঁড়াইয়া গামছা ঘুরাইয়া বাতাস খাইতেছিল, তাহাদের মধ্যে একজন অনুনয়ের কণ্ঠে চিন্তাকে বলিল,-

বেন, আমাদের এক গণ্ডূষ জল দাও না–বড় তেষ্টা পেয়েছে।

কান্তিলাল শুনিতে পাইয়া লাফাইয়া উঠিল—

কি বললি—তেষ্টা পেয়েছে? নবাবের নাতি সব! উৎরাই-পথে ডুলি নামিয়েছিস তাতেই তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। নে চল-ডুলি কাঁধে নে

গোকুলদাস ইতিমধ্যে ডুলির পর্দার অন্তরালে অদৃশ্য হইয়াছেন; ভিতর হইতে তীক্ষ্ণস্বর আসিল

ডুলি তোল—চাকা ডোববার আগে গদিতে পৌঁছানো চাই—গদিতে অনেক কাজ

চিন্তা দাঁড়াইয়া রহিল, ডুলি চলিয়া গেল। যতদূর দেখা গেল, ডুলির সহগামী কান্তিলাল ঘাড় ফিরাইয়া চিন্তার দিকে তাকাইতে লাগিল। তাহারা একটা বাঁকের মুখে অদৃশ্য হইয়া গেলে চিন্তা হাতের ঘটি রাখিয়া পূর্বস্থানে আসিল; কিছুক্ষণ শক্ত হইয়া থাকিবার পর একটা উষ্ণ নিশ্বাস ফেলিয়া টাকু তুলিয়া লইল। অস্ফুটস্বরে বলিল,–জানোয়ার সব। ঠগ জোচ্চোর ডাকাত

.

পাহাড়ের ভিতর দিয়া পথের যে-অংশটা গিয়াছে সেই পথ দিয়া এক তরুণ অশ্বারোহী নামিয়া আসিতেছে। অশ্বারোহীর নাম প্রতাপ সিং, তাহার পরিধানে যোধপুরী পায়জামা ও বড় বড় পকেটযুক্ত ফৌজী কুর্তা, পিঠে একনলা গাদা বন্দুক ঝুলিতেছে। প্রতাপ শিকারে বাহির হইয়াছিল; পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে জঙ্গল আছে। তাহাতে হরিণ ময়ুর খরগোশ পাওয়া যায়। কিন্তু আজ শিকারীর ভাগ্যে কিছুই জোটে নাই, প্রতাপ রিক্ত হস্তে ফিরিতেছিল।

ঘোড়াটি স্বচ্ছন্দ-মন্থরপদে চলিয়াছে। একস্থানে পথ দ্বিধাবিভক্ত হইয়া গিয়াছে, এইখানে পৌঁছিয়া প্রতাপ বলগা টানিয়া ঘোড়া দাঁড় করাইল, চোখের উপর করতল রাখিয়া নিম্নে উপত্যকার দিকে দৃষ্টি প্রেরণ করিল। এখান হইতে প্রতাপের বাসস্থান ক্ষুদ্র শহরটি ধোঁয়াটে বাতাবরণের ভিতর দিয়া দেখা যায়। এখনও অনেক দূর-ঘোড়ার পিঠে এক ঘণ্টার পথ।

এই সময়ে প্রতাপের পকেটের মধ্যে চিঁ চিঁ শব্দ হইল। প্রতাপ প্রথম একটু চমকিত হইয়া তারপর মৃদুকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। পকেটের উপর সন্তর্পণে হাত বুলাইয়া বলিল,–

আহা বেচারা। খিদে পেয়েছে বুঝি? আর একটু চুপ করে থাক, আস্তানায় পৌঁছুতে আর দেরি নেই। আমারও তেষ্টা পেয়েছে। মোতি, চল বেটা

বলগার ইঙ্গিত পাইয়া মোতি নিম্নাভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিল। এবার তাহার গতি অপেক্ষাকৃত দ্রুত।

চিন্তা পূর্ববৎ বসিয়া সুতা কাটিতেছে, দূর হইতে অশ্বক্ষুরধ্বনি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। চকিতে মুখ তুলিয়া চিন্তা উৎকর্ণভাবে শুনিল, ক্ষুরধ্বনি কাছে আসিতেছে। শুনিতে শুনিতে তাহার বিষণ্ণ মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। মোতির ক্ষুরধ্বনিতে হয়তো পরিচিত কোনও বিশিষ্টতা ছিল, চিন্তা চিনিতে পারিল কে আসিতেছে। সে দ্রুত বেশবাস সংবরণপূর্বক মুখখানি বেশ গম্ভীর করিয়া আবার তকলি কাটিতে লাগিল।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

অল্পক্ষণ মধ্যেই প্রতাপ প্রপার সম্মুখ উপস্থিত হইয়া রাশ টানিল, ঘোড়ার পিঠ হইতে লাফাইয়া অবতরণপূর্বক চিন্তার দিকে চাহিল, দেখিল চিন্তার পরম মনোযোগের সহিত তকলি কাটিয়া চলিয়াছে, পথিকসুজন যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে সেদিকে লক্ষ্যই নাই। প্রতাপের মুখে একটু চাপা হাসি খেলিয়া গেল, সে মোতির বলগা ছাড়িয়া দিয়া চিন্তার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, বন্দুকটা কাঁধ হইতে নামাইয়া রাখিয়া গূঢ়-কৌতুকে তাহার সুতাকাটা নিরীক্ষণ করিল, তারপর পরম সম্ভ্রমভরে হাত জোড় করিয়া বলিল,-

প্রপাপালিকে, পরিশ্রান্ত এবং পিপাসার্ত পথিক একটু জল পেতে পারে কি?

চোখাচোখি হইলেই আর হাসি চাপা যাইবে না, তাই চোখ না তুলিয়া ক্ষিপ্রহস্তে সুতা কাটিতে কাটিতে বলিল,-

পরিশ্রান্ত এবং পিপাসার্ত পথিক, পিপাসা নিবারণের আগে এইখানে বসে খানিক বিশ্রাম কর।

এই বলিয়া সে একটু সরিয়া বসিল, যেন ইঙ্গিতে নিজের পাশে প্রতাপের বসিবার স্থান নির্দেশ করিয়া দিল। প্রতাপ দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহার পাশে গিয়া বসিল, মহা আড়ম্বরে হস্ত প্রসারণ করিয়া বলিল,–

ভদ্রে, তোমার সুমধুর ব্যবহারে আমার ক্লান্তি আপনি দুর হয়েছে— তৃষ্ণাও আর নেই। তোমার অধর-সুধা পান করে—

চিন্তা ভ্রূভঙ্গি করিয়া তাহার পানে তাকাইল।

—অর্থাৎ তোমার অধরক্ষরিত বাক্যসুধা পান করে আমার তৃষ্ণা নিবারণ হয়েছে, জলের আর প্রয়োজন নেই।

চিন্তা বলিল,–প্রয়োজন আছে বৈ কি। মাথায় জল না ঢাললে তোমার মাথা ঠাণ্ডা হবে না।

উভয়ের মিলিত উচ্চহাস্যে অভিনয়ের মুখোশ খসিয়া পড়িল। প্রতাপ হাত ধরিয়া চিন্তাকে কাছে টানিয়া লইল, তারপর গাঢ়স্বরে বলিল,-

চিন্তা, এস বিয়ে করি— আর ভাল লাগছে না। শিকারের ছুতোয় এসে দুদণ্ডের জন্যে চোখে দেখা— একি ভাল লাগে? বল একটিবার মুখের কথা বল, কালই আমি তোমাকে ডুলিতে তুলে ঘরে নিয়ে যাব।

চিন্তার চোখ দুটি চাপা বাষ্পোচ্ছ্বাসে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এই প্রস্তাবটিই সে অনেকদিন হইতে আকাঙক্ষা করিতেছিল, আবার মনের কোণে একটু আশঙ্কাও ছিল। সে ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল,-

তুমি গণ্যমান্য লোক—পরপের মেয়েকে বিয়ে করবে?

প্রতাপ বলিল,—আমি রাজপুত, তুমি রাজপুতের মেয়ে— এর বেশী আর কি চাই? আমি মাকে বলেছি, তিনি খুব খুশি হয়ে রাজি হয়েছেন।

চিন্তা বলিল,-লোকে কিন্তু ছি ছি করবে।

করুক— লোকের কথায় কি আসে যায়? তোমার মন আছে কিনা তাই বল।–চিন্তা, আমার ঘরে যেতে তোমার ইচ্ছে করে না?

চিন্তার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। কত ইচ্ছা করে তাহা সে কি করিয়া বুঝাইবে? সে স্খলিতস্বরে বলিল,-

করে

প্রতাপ আবেগভরে চিন্তার স্কন্ধে বাহু দিয়া জড়াইয়া তাহাকে কাছে আকর্ষণ করিল,

ব্যস্— আর কিছুই চাই না

প্রতাপের পকেটের মধ্যে সম্ভবত দুই জনের দেহের চাপ পাইয়া অতি ক্ষীণ চিচি শব্দ উত্থিত হইল। প্রতাপের কণ্ঠোদগত আনন্দ-বিহ্বলতা আর শেষ হইতে পাইল না! সে থামিয়া গেল; তারপর উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল—

আরে— ওদের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। এই নাও তোমার জন্যে সওগাত এনেছি।

সুপরিসর পকেট হইতে প্রতাপ সন্তর্পণে দুইটি কপোত-শিশু বাহির করিল। কৃষ্ণবর্ণ বনকপোতের শাবক, এখনও ভাল করিয়া পালক গজায় নাই; চিন্তা সাগ্রহে তাহাদের হাতে তুলিয়া লইয়া উচ্ছসিত কণ্ঠে বলিল,-

কী সুন্দর পায়রার ছানা, আমি পুষব।—কোথায় পেলে এদের?

কোথায় আবার গাছের মগডালে বাসার মধ্যে বসেছিল, তুলে নিয়ে এলাম।

অ্যাঁ-মায়ের বাছাদের বাসা থেকে কেড়ে নিয়ে এলে?

কি করি? দেখলাম একটা বাজপাখি ওদের বাসা ঘিরে উড়ছে, ওদের মা বাপ প্রাণের ভয়ে পালিয়েছে। শেষে বাজের পেটে যাবে, তাই পকেটে করে নিয়ে এসেছি।

চিন্তা ছানা দুটিকে বুকের কাছে চাপিয়া ধরিল। অত্যাচারী পৃথিবীর উপর তাহার অভিমান স্ফুরিত হইয়া উঠিল—

কি হিংস্র নিষ্ঠুর সবাই। ডাকাত-ডাকাত সব।

সে কি আমিও ডাকাত হলাম?

হাঁ, তুমিও ডাকাত।

প্রতাপ ঈষৎ হাসিল! বলিল,–

আমি যদি ডাকাত হতাম চিন্তা, তাহলে আগে তোমাকে হরণ করে নিয়ে যেতাম।

উৎফুল্লনেত্রে চিন্তা প্রতাপের পানে চাহিল।

নিয়ে গেলে না কেন? আমি তোমাকে আঁচড়ে দিতাম, কামড়ে দিতাম, তারপর যেতাম

চিন্তা প্রণয়ভঙ্গুর হাসিল। প্রতাপ আঙুল দিয়া তাহার চিবুক তুলিয়া ধরিয়া চোখের মধ্যে চাহিল। রাজপুতের মেয়ে, হরণ করে নিয়ে না গেলে বিয়ে করেও সুখ হয় না। বেশ, তাই হবে। কাল লোকলস্কর নিয়ে ঢাকঢোল বাজিয়ে এসে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিয়ে যাব। কেমন, তাহাতে মন ভরবে তো?

দুজনে উদ্বেল আনন্দভরে পরস্পর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

.

প্রায় সায়ংকাল। অবসন্ন সূর্যাস্তের বর্ণচ্ছটা পশ্চিম দিঙমণ্ডলকে অরুণায়িত করিয়াছে।

শহরের এক অংশ; বঙ্কিম সঙ্কীর্ণ পথ দুর্গম নির্জন। এইখানে প্রতাপের প্রাচীন পৈতৃক বাসভবন। সম্মুখে একটি সিংদরজা আছে, ভিতরে খানিকটা মুক্ত স্থান। বাড়িটি আকারে বৃহৎ, কিন্তু বহুদিন সংস্কারের অভাবে কিছু জীর্ণ ও শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে।

বাড়ির সাবেক ভৃত্য লছমন উঠানের চিকু গাছতলায় শয়ন করিয়া বোধকরি ঘুমাইতেছিল; সে বৃদ্ধ হইয়াছে, ঘুমাইবার সময়-অসময় নাই। প্রতাপের বিধবা মাতা অস্থিরভাবে বার বার বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইতেছেন এবং আবার ভিতরে প্রবেশ করিতেছেন। তিনি ঈষৎ স্থূল কলেবরা; দেহের মাংস অকালে লোল হইয়া গিয়াছে। তাঁহার হৃদযন্ত্র অতিশয় দুর্বল, মনটিও উদ্বেগপ্রবণ, সহজেই উৎকণ্ঠিত হইয়া ওঠে। বিশেষত আজ তাঁহার উৎকণ্ঠার গুরুতর কারণ ঘটিয়াছে।

তিনি বারান্দায় আসিয়া উদ্বিগ্নকণ্ঠে ডাকিলেন,

লছমনভাই, ও লছমনভাই, এই ভর-সন্ধ্যেবেলা তুমি ঘুমুলে?

লছমন চেটাইয়ের উপর উঠিয়া বসিল।

ঘুমোব কেন বাঈ, ঘুমোব কেন— একটু গড়াচ্ছিলাম।

সুয্যি পাটে বসতে চলল, এখনও প্রতাপ ফিরল না লছমনভাই।

লছমন চিকু তলা হইতে উঠিয়া আসিল। বলিল,–

ফিরবে বৈ কি বাঈ, ফিরবে বৈ কি। তোমার জোয়ান ছেলে শিকারে বেরিয়েছে, ফিরবে বৈ কি। সেকালে কর্তারা শিকারে বেরুতো, তা রাত দুপুরের আগে কেউ ফিরতো না। কথায় বলে শিকরে বাজ আর প্যাঁচা দুইই শিকারী— কেউ দিনে কেউ রাত্তিরে।

মা কানের কাছে হাত তুলিয়া উৎকর্ণভাবে কিছুক্ষণ শুনিলেন।

ঐ বুঝি প্রতাপ এল, মোতির ক্ষুরের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি

আসবে বৈ কি বাঈ, আসবে বৈ কি।

বাহিরে প্রতাপের গৃহের সিংদরজা। সিংদরজার থামে একটুকরা কাগজ লটকানো রহিয়াছে।

প্রতাপকে পিঠে লইয়া মোতি হাঁটা-পথে আসিয়া সিংদরজায় প্রবেশ করিল; এই সময় কাগজের টুকরার উপর প্রতাপের নজর পড়িলে সে ঘোড়া থামাইয়া হাত বাড়াইয়া কাগজের টুকরা তুলিয়া লইল; ভ্রূ ঈষৎ তুলিয়া কাগজের লেখা পড়িতে লাগিল।

বারান্দায় দাঁড়াইয়া মা প্রতাপকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, তিনি দুহাতে বুক চাপিয়া উদ্বেগভরা মুখে প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। তাঁহার দুর্বল হৃদযন্ত্র অত্যন্ত দ্রুত স্পন্দিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

কাগজের লেখা পাঠ করিয়া প্রতাপ তাচ্ছিল্যভরে সেটা মুঠির মধ্যে গোলা পাকাইয়া লইল; তারপর অঙ্গনে প্রবেশ করিয়া লাফাইয়া মোতির পিঠ হইতে নামিয়া লছমনের হাতে রাশ ফেলিয়া দিল। লছমনকে বলিল,-

লছমনভাই, মোতিকে দানা-পানি দাও।

দেব বৈ কি ভাই, দেব বৈ কি। আজ বুঝি শিকার কিছু পেলে না?

পেয়েছি— পরে বলব।

হাসিয়া পিঠ হইতে বন্দুক নামাইতে নামাইতে প্রতাপ বারান্দায় গিয়া উঠিল। বারান্দার দেয়ালে পাশাপাশি দুটি খোঁটা পোঁতা ছিল, তাহার উপর বন্দুক রাখিয়া দিয়া প্রতাপ মার দিকে ফিরিল।

মা উদ্বিগ্নস্বরে বলিলেন,-প্রতাপ, চিঠি পড়লি?

প্রতাপ তাচ্ছিল্যভরে বলিল,-চিঠি? ও শেঠ গোকুলদাসের রোকা! ও কিছু নয়।

মা বলিলেন,-না না বাবা, তুই গোকুলদাসের চিঠি তুচ্ছ করিস নে! গোকুলদাস বড় ভয়ানক সাহুকার–কত লোকের সর্বনাশ করেছে তার ঠিক নেই

প্রতাপ এক হাতে মায়ের স্কন্ধ জড়াইয়া লইল, বলিল,–

তুমি ভয় পাচ্ছ কেন মা? বাবা তো মাত্র পাঁচশো টাকা ধার করেছিলেন যখন ইচ্ছে শোধ করে দেব।

মা বলিলেন,—ওরে না না, গোকুলদাস নিজে এসে চিঠি টাঙিয়ে গেছে, আর শাসিয়ে গেছে সুদে-আসলে তার দশ হাজার টাকা পাওনা হয়েছে; আজই নাকি মেয়াদের শেষ দিন; যদি শোধ না হয়, তোর জমি-জমা বাড়ি-ঘর সব বাজেয়াপ্ত করে নেবে।

তিনি আবার নিজের স্পন্দমান বুক চাপিয়া ধরিলেন। প্রতাপ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল,

সে কী। পাঁচশো টাকা দশ হাজার টাকা হবে কি করে?

লছমন তখনও মোতিকে আস্তাবলে লইয়া যায় নাই, অঙ্গনে দাঁড়াইয়া মাতা-পুত্রের কথা। শুনিতেছিল; সে উত্তর দিল,-

হয় বৈ কি ভাই, হয় বৈ কি। মহাজনের সুদ চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ে কিনা।

প্রতাপ হতবুদ্ধিভাবে বলিল, মহাজনের সুদ–হ্যাঁ— কিন্তু এ যে অসম্ভব। দশ হাজার টাকা...আমি এখনই যাচ্ছি গোকুলদাসের কাছে নিশ্চয় তোমাদের বুঝতে ভুল হয়েছে—

প্রতাপ ত্বরিতে গিয়া আবার ঘোড়ার পিঠে উঠিল, ঘোড়ার মুখ বাহিরের দিকে ফিরাইয়া বলিল,–মা, তুমি ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

সে বাহির হইয়া গেল।

.

প্রাচীরবেষ্টিত চতুষ্কোণ-ভূমির উপর শেঠ গোকুলদাসের দ্বিতল প্রাসাদ। সম্মুখে লৌহকবাটযুক্ত সিংদরজা; দুইজন তকমাধারী সান্ত্রী সেখানে পাহারা দিতেছে।

বাড়ির দ্বিতলের একটি জানালা খোলা রহিয়াছে। জানালার কবাট লৌহময় কিন্তু গরাদ নাই; সুতরাং এই পথে আমরা গোকুলদাসের তোশাখানায় প্রবেশ করিতে পারি।

তোশাখানা ঘরটি ঈষদন্ধকার; একটি মাত্র দরজা ও একটি জানালা আছে। দরজার দুই পাশে দুটি গাদা পিস্তল দেয়ালে আটকানো রহিয়াছে। গোকুলদাস ধর্মে জৈন কিন্তু নিজের

ঐশ্বর্য রক্ষার জন্য তিনি যে প্রাণীহত্যায় পরাঙ্মুখ নয়, পিস্তল দুটি তাহারই সাক্ষ্য দিতেছে।

ঘরের চারিটি দেয়াল জুড়িয়া সারি সারি লোহার সিন্দুক। ঘরের মাঝখানে মোটা গদির উপর হিসাবের বহি খাতা ও একটি কাঠের হাত বাক্স।

গোকুলদাস ঘরেই আছেন। প্রকাণ্ড চাবির থোলো হইতে একটি চাবি বাছিয়া লইয়া তিনি সিন্দুকের ছিদ্রমুখে প্রবেশ করাইয়া দিলেন, তারপর সতর্কভাবে দ্বারের দিকে একবার তাকাইয়া চাবি ঘুরাইলেন।

সিন্দুকের কবাট খুলিলে দেখা গেল, তাহার থাকে থাকে অসংখ্য সোনা ও জহরতের গহনা সাজানো রহিয়াছে, তাছাড়া মোটা মোটা মোহরের থলি ও মূল্যবান দলিলপত্র আছে। গোকুলদাস সন্তর্পণে একটি জড়োয়া-হার তুলিয়া লইয়া সতৃষ্ণভাবে সেটি দেখিতে লাগিলেন। কাবুলি মটরের মত কয়েকটা হীরা স্বল্পালোকেও ঝলমল করিতে লাগিল। গোকুলদাসের কণ্ঠ হইতে একটি লুব্ধ ঘুৎকার বাহির হইল।

এই সময় নিঃশব্দে দ্বার ঠেলিয়া একটি যুবতী ঘরে প্রবেশ করিল। চম্পা গোকুলদাসের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। গোলগাল গড়ন, মিষ্ট ছেলেমানুষী ভরা মুখে, সে পা টিপিয়া টিপিয়া গোকুলদাসের পিছনে গিয়া সিন্দুকের মধ্যে উঁকি মারিল; যাহা দেখিল তাহাতে তাহার মুখ দিয়া হর্ষোল্লাসসূচক শীৎকার বাহির হইল। স্বামীর সিন্দুকের অভ্যন্তরভাগ সে আগে কখনও দেখে নাই।

পলকমধ্যে গোকুলদাস সিন্দুকের কবাট বন্ধ করিয়া সিন্দুকে পিঠ দিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, যেন কোণ-নেওয়া বিড়াল। কিন্তু চম্পাকে দেখিয়া তাঁহার ভয় দূর হইল। তিনি বলিলেন,

ও চম্পা। আমি ভেবেছিলাম—

চম্পা হাসিয়া বলিল,—ডাকাত?

হীরার হারটি গোকুলদাসের হাতেই রহিয়া গিয়াছিল, এখন তিনি আবার সিন্দুক খুলিয়া উহা ভিতরে রাখিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

চম্পা লুব্ধস্বরে বলিল,-ওটা কি, দেখি দেখি। উঃ, কী সুন্দর হার।

চম্পা হারটি লইবার জন্য হাত বাড়াইয়াছিল, গোকুলদাস তাড়াতাড়ি উহা সরাইয়া লইলেন। বলিলেন,-

আরে না না, এতে হাত দিও না।

চম্পা বলিল,–কেন দেব না? আমি তোমার বৈরী কি না? তৃতীয় পক্ষের বৈরী কি বৈরী নয়? তবে আমি তোমার জিনিসে হাত দেব না কেন?

সংসারপ্রাজ্ঞ গুজরাতি স্ত্রীকে বৈরী বলিয়া থাকেন।

গোকুলদাস হার সিন্দুকের মধ্যে বন্ধ করিয়া চাবির গোছা কোমরে ঝুলাইলেন। বলিলেন,–

আহা, বুঝলে না চম্পা, ওটা এখনও আমার হয়নি বন্ধকী মাল। তবে একবার যখন আমার সিন্দুকে ঢুকেছে তখন আর বেরুচ্ছে না!

গোকুলদাস হুঁ হুঁ করিয়া হাসিলেন। চম্পা একটু বিমনাভাবে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সে মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল।

এই সিন্দুকগুলোকে তুমি বড্ড ভালবাস না?

গোকুলদাস উত্তরে কেবল আনুনাসিক হাসিলেন।

এর সিকির সিকি যদি বৌদের ভালবাসতে তাহলে তারা হয়তো সুখী হত।

গোকুলদাস ক্ষুদ্র ইন্দুর-চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া চাহিলেন।

কেন, আমার সঙ্গে বিয়ে হয়ে তুমি সুখী হওনি?

চম্পা মুখে একটা ভঙ্গি করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ওমা, হইনি আবার। তোমার মত মানুষ দেশে আর কটা আছে? দেশসুদ্ধ লোক তোমার ভয়ে কাঁপে, স্বয়ং রাজা তোমার খাতক! তোমাকে বিয়ে করে সুখী হইনি এমন কথা কে বলে!– নাও চল এখন, খাবার বেড়ে রেখে এসেছি এতক্ষণে বোধহয় সূর্য ডুবল।

জৈনগণ সূর্যাস্তের পূর্বেই নৈশ আহার সমাধা করেন।

এই সময় বাহিরের জানালার নীচে হইতে গণ্ডগোলের আওয়াজ আসিল। চম্পা দ্রুত জানালার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল, গোকুলদাস তাহার পশ্চাতে গিয়া সতর্কভাবে উঁকি মারিলেন।

নীচে সিংদরজার বাহিরে অশ্বারূঢ় প্রতাপের সহিত দ্বাররক্ষী সান্ত্রীদের বচসা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সান্ত্রীদ্বয় সিংদরজা আগলাইয়া দাঁড়াইয়াছে, প্রতাপকে প্রবেশ করিতে দিতেছে না।

প্রতাপ বলিতেছে-শেঠের সঙ্গে এখনি আমার দেখা না করলেই নয়

সান্ত্রী বলিল,-শেঠ এ সময় কারুর সঙ্গে দেখা করে না। যাও–কাল সকালে এস।

কিন্তু আজ আমাকে দেখা করতেই হবে বড় জরুরী দরকার

চম্পা জানালায় গোকুলদাসের দিকে ফিরিল।

হাঁগা, কে ও নওজোয়ান? ওকে তাড়িয়ে দিচ্ছে কেন?

গোকুলদাস বলিলেন,-চুপ–আস্তে। ও একটা রাজপুত আমার খাতক। বোধ হয় টাল শোধ দিতে এসেছে

তাহলে?

চুপ—তুমি ওসব বুঝবে না।

নীচে সান্ত্রীরা লোহার কাট বন্ধ করিয়া দিতেছে।

প্রতাপ বলিল,–আজ কিছুতেই দেখা হবে না?

সান্ত্রী বলিল,-না, আজ রাজা এলেও দেখা হবে না।

ক্রুদ্ধ-হতাশ-চক্ষু ঊর্ধ্বে তুলিতেই জানালার উপর প্রতাপের দৃষ্টি পড়িল। গোকুলদাস ঝটিতি জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন। প্রতাপ কিছুক্ষণ বিস্ফারিত নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া রহিল, তার ক্রোধতপ্ত একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ঘোড়ার মুখ ফিরাইল।

2

পরদিন প্রভাত। পাখিরা কলরব করিতেছে, দূরে মন্দির হইতে প্রভাত-আরতির শঙ্খ ঘণ্টারব আসিতেছে।

প্রতাপ তাহার শয়নকক্ষে শয্যায় ঘুমাইতেছে। তাহার পালঙ্কের শিয়রে দুইটি পট দেয়ালে টাঙানো রহিয়াছে; একটি রানা প্রতাপ সিংহের, অপরটি ছত্রপতি শিবাজীর।

অঙ্গনের দিকে জানালা দিয়া সূর্যের নবারুণ আলোক ঘরে প্রবেশ করিতেছিল, সহসা কয়েকজনের কলহরুক্ষ কণ্ঠস্বর শোনা গেল। প্রতাপ ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিল, তারপর ঈষৎ বিস্ময়ে শয্যাপাশে উঠিয়া বসিল। ঘুমের জড়তা তখনও ভাল করিয়া ভাঙে নাই

অকস্মাৎ বারান্দা হইতে তাহার মাতার মর্মান্তিক কাতরোক্তি কানে আসিল।

হাঁ রণছোড়জী, এ কি করলে এ কি করলে

প্রতাপ এক লাফে জানালার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। জানালা দিয়া প্রাঙ্গণের সমস্তটাই দেখা যাইতেছে। শেঠ গোকুলদাস এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁহার সঙ্গে জন দশ বারো লাঠিয়াল অনুচর। একজন অনুচর মোতির লাগাম ধরিয়া বাহিরের দিকে লইয়া যাইতেছে এবং বৃদ্ধ লছমন তাহাকে বাধা দিবার চেষ্টা করিতেছে।

গোকুলদাস বলিতেছেন,—যাও নিয়ে যাও আমার আস্তাবলে—

লছমন বলিল,-না না—ছেড়ে দাও মোতিকে– আমার মালিকের ঘোড়া আমি নিয়ে যেতে দেব না

যে লোকটা মোতিকে লইয়া যাইতেছিল সে লছমনকে সজোরে একটা ঠেলা দিল, লহমন ছিটকাইয়া গিয়া চিকু গাছের তলায় পড়িল।

জানালায় প্রতাপের মা তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন,–

ওরে প্রতাপ কি হবে বাবা

ক্রোধে বিস্ময়ে প্রতাপের কণ্ঠরোধ হইয়া গিয়াছিল, সে এক হাতে মাকে সরাইয়া দিয়া ঘর হইতে বাহির হইল।

বাহিরের বারান্দায় যেখানে বন্দুকটা দেয়ালে টাঙানো ছিল, ঠিক সেই স্থানে গোকুলদাসের অনুচর কান্তিলাল দাঁড়াইয়া ছিল, প্রতাপ তাহাকে লক্ষ্য না করিয়া সদর দরজা দিয়া বাহির হইয়া প্রাঙ্গণে নামিয়া লইয়া গেল। গোকুলদাসের সম্মুখীন হইয়া কঠোর স্বরে কহিল,

কি হয়েছে? কী চাও তুমি আমার বাড়িতে?

গোকুলদাস ব্যঙ্গভরে বলিলেন,—ওহে, ঘুম ভেঙেছে এতক্ষণে। যারা মহাজনের টাকা ধারে তাদের এত ঘুম ভাল নয়। এখন গা তোলো–আমার বাড়ি ছেড়ে দাও।

তোমার বাড়ি!

হাঁ, আমার বাড়ি। তোমার বাপ টাকা ধার করেছিল, কাল তার মেয়াদ ফুরিয়েছে। আজ আমি সমস্ত সম্পত্তি দখল করেছি; এ বাড়ি এখন আমার।

আদালতের হুকুম এনেছ?

গোকুলদাস মিহি সুরে হাস্য করিলেন

আদালতের হুকুম আমার দরকার নেই। আমার হক, আমি দখল করেছি। তোমার যদি কোনও নালিশ থাকে তুমি আদালতে যাও।

প্রতাপ এতক্ষণ অতি কষ্টে ধৈর্য ধরিয়া কথা বলিতেছিল, এখন আর পারিল না। তাহার পায়ের কাছে একটা চেলাকাঠ পড়িয়াছিল, সে তাহাই তুলিয়া লইল। আরক্ত চক্ষে চাহিয়া বলিল,-

বটে! আমার সম্পত্তি তুমি গায়ের জোর দখল করবে! পাজি বেনিয়ার বাচ্চা, বেরোও আমার বাড়ি থেকে, নইলে

প্রতাপ হিংস্রভাবে চেলাকাঠ গোকুলদাসের মাথার উপর তুলিল, গোকুলদাস সভয়ে মস্তক রক্ষা করিবার জন্য হাত তুলিলেন।

এই সময় বারান্দা হইতে কান্তিলালের কণ্ঠস্বর আসিল—

খবরদার!

সকলে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, কান্তিলাল প্রতাপের বন্দুক লইয়া তাহার দিকে লক্ষ্য করিয়া আছে। গোকুলদাস এবার নির্ভয় হইয়া কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইলেন।

কান্তিলাল বলিল,-লাঠি ফেলে দাও—

প্রতাপ নিস্ফল ক্রোধে ফুলিতে লাগিল কিন্তু হাতের লাঠি ফেলিল না।

কান্তিলাল আবার বলিল,-লাঠি ফেলে দাও নইলে

বন্দুকের ঘোড়া টানার কট করিয়া শব্দ হইল। এই সময় আলুথালু বেশে প্রতাপের মা ভিতর হইতে বারান্দায় বাহির হইয়া আসিলেন, তাঁহার চেহারা দেখিলেই বোঝা যায় তাঁহার মানসিক বিপন্নতা চরমসীমায় পৌঁছিয়াছে।

প্রতাপ—ওরে প্রতাপ, লাঠি ফেলে দে বাবা! আয়, আমার কাছে আয়

প্রতাপ দেখিল মা দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া টলিতেছেন, এখনি পড়িয়া যাইবেন। সে হাতের লাঠি ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া গিয়া মাকে ধরিয়া ফেলিল।

মা-! কি হয়েছে মা?

মা কম্পিত নিশ্বাস টানিয়া বলিলেন, কিছু না বাবা, বুকটা বড় ধড়ফড় করছে! চল্ বাবা, আমরা চলে যাই

গোকুলদাস বলিলেন, হ্যাঁ, ভাল চাও তো ছেলের হাত ধরে বেরিয়ে যাও আমার কাছে চালাকি চলবে না।

মা বলিলেন,-চল বাবা—এখান থেকে আমায় নিয়ে চল—

মাতা-পুত্র হাত ধরাধরি করিয়া এক পা অগ্রসর হইলেন, তারপর মায়ের বক্ষ ভেদ করিয়া একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস বাহির হইল—

উঃ—আমার স্বামীর ভিটে-শ্বশুরের ভিটে—

চাপা কান্নার দুর্নিবার উচ্ছ্বাস তাঁহার কণ্ঠে আসিয়া আটকাইয়া গেল, শিথিল অঙ্গে ধীরে ধীরে তিনি মাটিতে শুইয়া পড়িলেন। প্রতাপ সভয়ে ডাকিল,

মা–

মা সাড়া দিলেন না। প্রতাপ নতজানু হইয়া তাঁহার বুকে কান রাখিয়া শুনিল, বুকের শেষ দুর্বল স্পন্দন ধীরে ধীরে থামিয়া যাইতেছে।

মুখ তুলিয়া প্রতাপ পাগলের মত চিৎকার করিয়া উঠিল— মা—! মা–! মা–!

.

রাত্রি। আকাশে পূর্ণচন্দ্র।

শ্মশানে চিতার উপর প্রতাপের মাতার দেহাবশেষ পুড়িতেছে। অদূরে প্রতাপ একটি শিলাখণ্ডের উপর করলগ্নকপোলে বসিয়া একদৃষ্টে চিতার পানে চাহিয়া আছে। তাহার কয়েকজন শ্মশানসঙ্গী প্রতিবেশী আশে-পাশে বসিয়া আছে— সকলেই নীরব। তাহাদের মুখের উপর চিতার অস্থির আলো খেলা করিতেছে।

প্রতাপের মুখ পাথরের মত নিশ্চল, আলো ছায়ার চঞ্চল খেলা তাহার মুখে কোনও ভাবান্তর আনিতে পারিতেছে না।

নিকটবর্তী গাছের ডালে একটা শকুন কর্কশকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল। সকলের মুখ তুলিয়া সেইদিকে চাহিল, কিছু প্রতাপ মুখ তুলিল না, যেমন অপলক চক্ষে চিতার পানে চাহিয়া ছিল তেমনি চাহিয়া রহিল।

.

শ্মশান হইতে বহু দূরে জলসত্রের ক্ষুদ্র কক্ষে বাতায়ন দিয়া ঐ চাঁদের আলো মেঝের উপর পড়িয়াছে। ভিতর হইতে ঘরের দ্বার রুদ্ধ, ঘরের কোণে স্তিমিত দীপশিখা জ্বলিতেছে। মেঝের উপর উপুড়করা একটি বেতের টুকরির ভিতর হইতে মাঝে মাঝে সুখপাখিত পক্ষিশাবকের তন্দ্রাক্ষীণ কিচিমিচি শব্দ আসিতেছে।

কাঠের একটি সুপরিসর হিচকা বা দোলনার উপর চিন্তা বসিয়া আছে। এই দোলনাই তাহার শয্যা। আজ চিন্তার চোখে নিদ্রা নাই; প্রতাপ আসিবে বলিয়া চলিয়া গিয়াছে, আর আসে নাই। কেন আসিল না? তবে কি তাহার অনুরাগ শুধু মুখের কথা? দুদণ্ডের চিত্ত-বিনোদন? ভাবিয়া ভাবিয়া চিন্তা কূলকিনারা পায় নাই; মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায় গড়াইয়া গিয়াছিল, সন্ধ্যা মধ্যরাত্রের নিথর নিষ্ফলতায় ভরিয়া গিয়াছে। কেন সে আসিল না? আজ প্রতাপ

আসিবে বলিয়া চিন্তা বন্যকুসুম তুলিয়া দুটি মালা গাঁথিয়া রাখিয়াছিল— সে-মালা চিন্তা কাহার গলায় দিবে?

ব্যথাবিষণ্ণ সুরে সে নিজমনেই গাহিতেছিল—

আমার মনে যে-ফুল ফুটেছিল
আকাশের সূর্য তারে শুকিয়ে দিল রে।
ধুলাতে পড়ল ঝরে সে
বাতাসের নিদয় পরশে
বুকে মোর কাঁটার বেদনা
বুক দুখিয়ে দিল রে।
আমার মনে চাঁদ—
আমার মনে চাঁদ যে উঠেছিল
ও তারে প্রলয় মেঘে লুকিয়ে দিল রে।
মরমের মৌন অতলে
নিরাশার ঢেউ যে উথলে—
জীবনের পাওনা-দেনা মোর
কে চুকিয়ে দিল রে।

গুনগুন করিয়া গাহিতে গাহিতে চিন্তা ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইল, টুকরি তুলিয়া কপোতশিশু দুটিকে দেখিল, জানালায় দাঁড়াইয়া জ্যোৎস্না নিষিক্ত বহিঃপ্রকৃতির পানে চাহিয়া রহিল, কিন্তু তাহার সংশয়পীড়িত মন শান্ত হইল না।

.

ওদিকে অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া শেষ হইয়া গিয়াছে; প্রতাপ ও তাহার সঙ্গীগণ জল ঢালিয়া চিতা নিভাইতেছে।

চিতা ধৌত করিয়া সকলে চিতার উপর এক মুষ্টি করিয়া ফুল ফেলিয়া দিল, তারপর সরিয়া আসিয়া একত্র দাঁড়াইল। সঙ্গীদের মধ্যে যিনি বয়োজ্যষ্ঠ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া প্রতাপ বলিল,-

অম্বুভাই, তোমরা আমার দুর্দিনের বন্ধু। আমি আর তোমাদের কী বলব, মা স্বর্গ থেকে তোমাদের আশীর্বাদ করবেন। শ্মশানের কাজ তো শেষ হয়েছে, এবার তোমরা ঘরে ফিরে যাও।

অম্বুভাই প্রশ্ন করিল,—আর তুমি?

প্রতাপ বলিল,—আমি আর কোথায় যাব অম্বুভাই, আমার তো যাবার স্থান নেই।

অম্বুভাই বলিল,-ও কথা বোলো না প্রতাপ। আমার কুঁড়েঘর যতদিন আছে ততদিন তোমারও মাথা গুঁজবার স্থান আছে। চল, আজ রাত্রিটা বিশ্রাম কর, তারপর কাল যা হয় স্থির করা যাবে।

প্রতাপ বলিল,-আমার কর্তব্য আমি স্থির করে নিয়েছি। তোমরা ঘরে ফিরে যাও অম্বুভাই। আমি অন্য পথে যাব।

অম্বুভাই বলিল, অন্য পথে? কোথায়? কোন্ পথ?

প্রতাপ বলিল,—আমি যে-পথে যাব সে পথে আজ তোমরা যেতে পারবে না, তাই তোমাদের কাছে বিদায় নিচ্ছি। হয়তো আবার কোনওদিন দেখা হবে। —বিদায় বন্ধু, বিদায় ভাই সব। নমস্কার, তোমাদের নমস্কার।

প্রতাপ যুক্তকরে সকলকে বিদায়-নমস্কার করিল। সকলে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

.

শেঠ গোকুলদাসের প্রাসাদ মধ্যরাত্রির চন্দ্রালোকে ঘুমাইতেছে। কিংবা হয়তো ঘুমায় নাই। দ্বিতলে তোশাখানার জানালাটি খোলা আছে এবং সেখান হইতে মৃদু প্রদীপের আলোক নির্গত হইতেছে; মনে হয় প্রাসাদ ঘুমাইলেও তাহার একটি চক্ষু জাগিয়া আছে।

সিংদরজার সম্মুখে সশস্ত্র সান্ত্রিগণ কিন্তু দুই চক্ষু মুদ্রিত করিয়াই ঘুমাইতেছে। না ঘুমাইবার কোনও কারণ নাই, শেঠ গোকুলদাসের দেউড়িতে চোর ঢুকিবে এত বড় সাহসী চোর দেশে নাই।

সিংদরজার দুইপাশে দীর্ঘ প্রাচীর চলিয়া গিয়াছে। দক্ষিণ দিকের দেয়াল যেখানে মোড় ঘুরিয়া পিছন দিকে গিয়াছে, সেই কোণের কাছে সহসা একটি মাথা উঁকি মারিল। চাঁদের আলোয় দেখা গেল–প্রতাপ। সে শ্মশানে সঙ্গীদের বিদায় দিয়া সটান এখানে আসিয়াছে। গোকুলদাসের সহিত তাহার হিসাব-নিকাশ এখনও শেষ হয় নাই।

প্রতাপ দেয়ালের কোণ হইতে গলা বাড়াইয়া দেখিল প্রহরীরা ঘুমাইতেছে। তখন সে দেয়ালের গা ঘেঁষিয়া পিছন দিকে ফিরিয়া চলিল। বাড়ির পশ্চাদ্দিকে যেখানে পাঁচিল শেষ হইয়াছে সেখানে উপস্থিত হইয়া প্রতাপ দেখিল পাঁচিলের গায়ে একটি দরজা রহিয়াছে। ইহা চাকর বাকরদের ব্যবহার্য খিড়কি দরজা।

খিড়কি দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। কিন্তু পাঁচিল বেশী উঁচু নয়। প্রতাপ লাফাইয়া পাঁচিলের কিনারা ধরিয়া ফেলিল, তারপর বাহুর বলে শরীরকে উর্ধ্বে তুলিয়া পাঁচিলের উপর উঠিয়া বসিল। ভিতরে কেহ কোথাও নাই, শষ্পাকীর্ণ ভূমির উপর শিশিরকণা ঝিকমিক করিতেছে। বাড়িটি সবুজ জলে ভাসমান এক চাপ বরফের মত দেখাইতেছে। পিছনের দেয়াল ঘেঁষিয়া একসারি ঘর, ইহা গোকুলদাসের আস্তাবল ও গোহাল।

প্রতাপ নিঃশব্দে নিজেকে পাঁচিল হইতে ভিতর দিকে নামাইয়া দিল। খিড়কির দরজা কেবল অর্গলবন্ধ ছিল, প্রথমেই সেটি খুলিয়া দিল; প্রয়োজন হইলে পলায়নের রাস্তা খোলা চাই।

তারপর সে সতর্কপদে পিছনের ঘরগুলির দিকে চলিল। মানুষ কেহ নাই; একটি ঘরে কয়েকটি গরু রহিয়াছে। এইরূপ কয়েকটি ঘর পার হইবার পর একটি ঘরের সম্মুখীন হইতেই ভিতরের অন্ধকার হইতে ঘোড়ার মৃদু হ্রেষাধ্বনি আসিল। প্রতাপ চিনিল—মোতি।

ঘরের সম্মুখে দ্বার নাই, কেবল দুটি বাঁশ পাশাপাশি অর্গল রচনা করিয়াছে। প্রতাপ বাঁশ দুটি সন্তর্পণে সরাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

আস্তাবলের মধ্যে মোতি প্রভুকে দেখিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, প্রতাপ তাহার গায়ে মুখে হাত বুলাইয়া তাহাকে শান্ত করিল, তারপর দেয়ালে-টাঙানো লাগাম লইয়া তাহার মুখে পরাইল। জিনের পরিবর্তে একটি কম্বল তাহার পিঠে বাঁধিল, লাগাম ধরিয়া বাহিরে লইয়া আসিল।

এই সব ব্যাপারে একটু শব্দ হইল বটে কিন্তু ভাগ্যক্রমে কেহ জাগিল না। প্রতাপ মোতিকে লইয়া খিড়কি দরজা দিয়া বাহির হইল; কিছুদুর একটা গাছের তলায় লইয়া গিয়া তাহার গলা জড়াইয়া কানে কানে বলিল,-

মোতি, এইখানে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাক। যতক্ষণ না ফিরে আসি শব্দ করিসনি।

মোতি সম্মতিসূচক শব্দ করিল। তখন প্রতাপ তাহার গলা চাপড়াইয়া আবার ভিতরে গিয়া প্রবেশ করিল। এইবার আসল কাজ।

প্রতাপ দুই হাত ধীরে ধীরে ঘষিতে ঘষিতে ঊর্ধ্বে প্রাসাদের দিকে চাহিল।

তোশাখানার গদির উপর বসিয়া গোকুলদাস মোহর গণিতে ছিলেন। তাঁহার হাতবাক্সের পিঠের উপর সারবন্দী সিপাহীর মত থাকে থাকে মোহরের স্তম্ভ গড়িয়া উঠিতেছিল। চম্পা গদির এক পাশে অর্ধশয়ান অবস্থায় চিবুকের নীচে করতল রাখিয়া নিদ্রালুনেত্রে দেখিতেছিল।

পিতলের দীপদণ্ডে তৈলপ্রদীপ মৃদু আলো বিকীর্ণ করিতেছিল। ঘরে আর কেহ নাই। ভারী মজবুত দরজা ভিতর হইতে বন্ধ।

ঘুম-জড়ানো চোখে চম্পা ছোট একটি হাই তুলিল।

আর কত মোহর গুণবে? এবার শোবে চল না।

গোকুলদাস থলি হইতে আরও এক মুঠি মোহর বাহির করিয়া গণিতে গণিতে বলিলেন,–

হুঁ হুঁ-এই যে হল—

এই সময় খোলা জানালার বাহিরে প্রতাপের মুখ অস্পষ্টভাবে দেখা গেল; গোকুলদাস মোহর গণনায় মগ্ন; চম্পার পিঠ জানালার দিকে; সুতরাং কেহই তাহাকে লক্ষ্য করিল না।

প্রতাপ নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইল, তাহার সতর্ক চক্ষু একবার ঘরের চারিদিক ঘুরিয়া আসিল। বন্ধ দরজার দুই পাশে দুটি পিস্তলের উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল। কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সে দেয়াল ঘেঁষিয়া ছায়ার মত সেই দিকে অগ্রসর হইল।

ইতিমধ্যে গোকুলদাস ও চম্পার মধ্যে অলস বাঙ বিনিময় চলিয়াছে।

চম্পা বলিতেছে,— আচ্ছা, বার বার মোহর গুণে কি লাভ হয়? মোহর কি গুণলে বাড়ে?

গোকুলদাস একটি সন্দেহজনক মোহর আলোর কাছে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে দেখিতে নাকিসুরে হাস্য করিলেন।

হুঁ হুঁ হুঁ তুমি কি বুঝবে। মেয়েমানুষ আর টাকা— দুইই সমান, কড়া নজর না রাখলে হাতছাড়া হয়ে যায় হুঁ হুঁ হুঁ

কথাটা চম্পার গায়ে লাগিল। সে উঠিয়া বসিয়া স্থিরনেত্রে স্বামীর মুখের পানে চাহিল।

টাকার কথা তুমি বলতে পার, কিন্তু মেয়েমানুষের কি জানো তুমি? তিনবার বিয়ে করলেই হয় না।

গোকুলদাস হাসিলেন হুঁ হুঁ হুঁ

চম্পার চক্ষু প্রখর হইয়া উঠিল।

কড়া নজর না রাখলে মেয়েমানুষ হাতছাড়া হয়ে যায়! আমার ওপর কত নজর রাখো তুমি? তার মানে কি আমি মন্দ?

গোকুলদাস বলিলেন,—শাস্ত্রে বলে পুরুষের ভাগ্য আর স্ত্রীলোকের চরিত্র হুঁ হুঁ হুঁ

চম্পা অধর দংশন করিল।

দ্যাখো, স্বামীর নিন্দে করতে নেই, স্বামী মাথার মণি। কিন্তু তুমি তুমি মহাপাপী। একদিন বুঝবে আমি সতীলক্ষ্মী কি না—যেদিন তোমার চিতায় আমি সহমরণে যাব। সেদিন যখন আসবে—

বদ্ধদ্বারের নিকট হইতে গম্ভীর আওয়াজ আসিল—

সেদিন এসেছে।

চম্পা ও গোকুলদাস একসঙ্গে দ্বারের দিকে ফিরিলেন; দেখিলেন প্রতাপ দাঁড়াইয়া আছে, তাহার দুই হাতে দুটি পিস্তল।

কিছুক্ষণ জড়বৎ থাকিয়া গোকুলদাস জাঁতিকলে পড়া ইদুরের মত একটি শব্দ করিয়া দুই হাতে হাতবাক্সটি আলাইয়া তাহার উপর উপুড় হইয়া পড়িলেন। চম্পা একেবারে পাথরের মূর্তিতে পরিণত হইয়াছিল, সে তেমনি বসিয়া রহিল।

প্রতাপ আসিয়া তাহাদের নিকট দাঁড়াইল; তাহার চোখে কঠিন কাচের মত দৃষ্টি

গোকুলদাস, আমাকে চিনতে পার?

গোকুলদাস ভয়ে ভয়ে একটু মাথা তুলিলেন। বলিলেন,–

অ্যাঁ-হ্যাঁ-প্রতাপভাই—

প্রতাপ বলিল,-মহাজন, আজ তোমার দিন ফুরিয়েছে তা বুঝতে পারছ?

গোকুলদাসের কণ্ঠস্বর ভয়ে তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল—

না না না, প্রতাপভাই, তুমি বড় ভাল ছেলে বড় সাধু ছেলে— তোমাকে আমি সব সম্পত্তি ফিরিয়ে দেব

প্রতাপ ডান হাতের পিস্তলটা তাহার রগের কাছে লইয়া গিয়া বলিল,–

চুপ–আস্তে। চেঁচিয়েছ কি গুলি করে খুলি উড়িয়ে দেব।

গোকুলদাস ঢোক গিলিয়া নীরব হইলেন। এমন সময় চম্পা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই প্রতাপের বাঁ হাতের পিস্তল তাহার দিকে ফিরিল।

প্রতাপ বলিল,-বেন, তোমাকে আমি কিছু বলতে চাই না, কিন্তু গোলমাল করলে তুমিও মরবে।

চম্পার সুন্দর মুখখানি বিচিত্র উত্তেজনায় আরও সুন্দর দেখাইতেছিল, সে চাপা গলায় বলিল,-

না, আমি গোলমাল করব না। কিন্তু, ওকে তুমি ছেড়ে দাও প্রাণে মেরো না।

প্রতাপ বলিল,-প্রাণে মারব না! ও আমার কি করেছে তা জানো?

চম্পা বলিল,-জানি। ও তোমার যথাসর্ব কেড়ে নিয়েছে, ওর জন্যেই তোমার মার মৃত্যু হয়েছে। ও মহাপাপী। কিন্তু তবু ভাই, তুমি ওকে ছেড়ে দাও। আমি ওর জন্যে বলছি না, তুমি আমাকে বহিন বলেছ, আমার মুখ চেয়ে ওর প্রাণ ভিক্ষা দাও।

চম্পা যেখানে দাঁড়াইয়াছিল সেইখানেই নতজানু হইয়া বলিল,–

ভাই, আমার দিকে চেয়ে দ্যাখো–আমার কুড়ি বছর বয়স, আমাকে বিধবা কোরো না

গোকুলদাস চি চি শব্দে যোগ করিয়া দিলেন,

শুধু ও নয়, আরও দুজন আছে

প্রতাপ বলিল,-চোপরও!

গোকুলদাস আবার কাঠের পুতুলের মত নিঃসাড় হইয়া রহিলেন। চম্পা বলিল, ভাই প্রতাপ ভাই-

প্রতাপ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ক্ষণেক চিন্তা করিল। গোকুলদাসকে হাতে পাইয়া ছাড়িয়া দেওয়া তাহার পক্ষে বড় মর্মান্তিক ব্যর্থতা; এখনও তাহার বুকে মায়ের চিতার আগুন জ্বলিতেছে। কিন্তু এদিকে এই নিরপরাধী যুবতী বিধবা হয়। প্রতাপ তিক্তদৃষ্টিতে গোকুলদাসের পানে চাহিল।

চম্পা আবার বলিল,-ভাই! প্রতাপভাই।

প্রতাপ বলিল,-ছেড়ে দিতে পারি— যদি—

উদ্ভাসিত মুখে চম্পা উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল,–

তুমি আর যা বলবে তাই করব। কী করব বল?

প্রতাপ দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিল। গোকুলদাসের পক্ষে মৃত্যুর চেয়েও বড় শাস্তি আছে। সে বলিল,-

প্রথমে চাবি নিয়ে সব সিন্দুক খুলে দাও।

গোকুলদাস আঁকুপাঁকু করিয়া উঠিলেন।

অ্যাঁ— তবে কি?

প্রতাপ দুইটি পিস্তল গোকুলদাসের দুই চোখের অত্যন্ত নিকটে লইয়া গিয়া বলিল,-

চুপ করে থাক্ বেইমান হারামী; কথা কয়েছিস কি মরেছিস। চম্পাকে বলিল,—যা বললাম কর।

চম্পা ত্বরিতে গোকুলদাসের কোমর হইতে চাবির গোছা লইয়া একে একে সব সিন্দুকগুলি খুলিয়া দিল। প্রত্যেকটির জঠরে বহু দলিল, মোহরের থলি ও বন্ধকী গহনা দেখা গেল।

চম্পা বলিল,-এই যে প্রতাপভাই, এবার কি করব বল?

প্রতাপ বলিল,-এবার বেশ ভারী দেখে দুটো মোহরের থলি নাও।—নিয়েছ?

হাঁ ভাই, এই যে নিয়েছি

গলায় দড়ি বাঁধা দুটি পরিপুষ্ট থলির মুঠ ধরিয়া চম্পা দেখাইল।

প্রতাপ বলিল,-আচ্ছা, এবার থলি দুটোকে জানালার বাইরে ফেলে দাও।

চম্পা ভারী থলি দুটি বহিয়া জানালার কাছে লইয়া গেল, তারপর একে একে তুলিয়া জানালার বাহিরে ফেলিয়া দিল। নীচে ধপ ধপ করিয়া শব্দ হইল।

.

নীচে সিংদরজার সম্মুখে সান্ত্রীরা পূর্ববৎ ঘুমাইতেছিল, ধপ ধপ শব্দে চমকিয়া জাগিয়া তাহারা সন্দিগ্ধভাবে পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করিতে লাগিল।

.

এদিকে তোশাখানার জানালায় চম্পা ভিতর দিকে ফিরিয়া সপ্রশ্নচক্ষে প্রতাপের পানে চাহিল। প্রতাপ সন্তোষসূচক ঘাড় নাড়িয়া বলিল,-

এবার সিন্দুক থেকে দলিলের কাগজ বার করে নিয়ে এস—

গোকুলদাস আর একবার আকুল-বিকুলি করিয়া উঠিতেই প্রতাপের পিস্তল তাঁহার ললাট স্পর্শ করিল, তিনি আবার তৃষ্ণীভাব ধারণ করিলেন। চম্পা ছুটিয়া গিয়া সিন্দুক হইতে দুই মুঠি ভরিয়া দলিলের পাকানো কাগজ লইয়া প্রতাপের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রতাপ নীরবে শুধু চোখের সঙ্কেতে প্রদীপশিখা দেখাইয়া দিল। ইঙ্গিত বুঝিতে চম্পার বিলম্ব হইল না, সে দলিলগুলি আগুনের উপর ধরিল।

দলিলগুলি জ্বলিয়া উঠিলে চম্পা সেগুলি মেঝের উপর রাখিয়া দিল। প্রতাপ আবার তাহাকে মস্তকের ইঙ্গিত করিল, সে ছুটিয়া পাঁজা ভরিয়া দলিল আনিয়া আগুনের উপর ঢালিয়া দিতে লাগিল। চম্পার ভাব দেখিয়া মনে হয়, সে এই কাজ বেশ উপভোগ করিতেছে। ক্রমে একটি বেশ বড় গোছের ধুনি জ্বলিয়া উঠিল।

গোকুলদাস পঙ্কে-পতিত হাতির মত বসিয়া নিজের এই সর্বনাশ দেখিতে লাগিলেন; কিন্তু রগের কাছে পিস্তল উদ্যত হইয়া আছে, তিনি বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে সাহস করিলেন না। তাঁহার মুখগহ্বর কেবল নিঃশব্দে ব্যাদিত এবং মুদিত হইতে লাগিল।

সমস্ত দলিল অগ্নিতে সমর্পিত হইলে, প্রতাপ পিস্তল দুটি নিজ কোমরবন্ধে রাখিল, শুষ্ক কঠিন হাসিয়া বলিল,–

মহাজন, তোমার বিষদাঁত ভেঙে দিয়েছি, এখন যত পারো ছোবল মারো। একটা দুঃখ, তোমার সিন্দুক লুঠ করে ন্যায্য অধিকারীদের সোনাদানা ফিরিয়ে দিতে পারলাম না। হয়তো আবার আসতে হবে। বেন, তোমার বৈধব্য কামনা করি না, কিন্তু স্বামীকে যদি বাঁচিয়ে রাখতে চাও তাহলে ওকে সৎপথে চালিও। চললাম।

প্রতাপ জানালার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। চম্পা জোড়হস্তে তদগত কণ্ঠে বলিল,-

ভাই, তোমাকে প্রণাম করছি। তুমি আমার প্রাণ দিয়েছ, যতদিন বাঁচব তোমার গুণ গাইব—

এই সময় দ্বারের বাহির বহু কণ্ঠের আওয়াজ শোনা গেল— পুরী জাগিয়া উঠিয়াছে। প্রতাপ এক লাফে জানালা ডিঙাইয়া বাহিরে অদৃশ্য হইয়া গেল। দরজায় করাঘাত পড়িতেই গোকুলদাস লাফাইয়া উঠিয়া উন্মত্ত কণ্ঠে চিৎকার করিলেন,

চোর চোর-ডাকাত! আমার সর্বনাশ করে গেল। ওরে হতভাগা মেয়েমানুষ, দরজা খুলে দে না–

চম্পা হাসিয়া বলিল,-তুমি খোলো না। আমি অবলা মেয়েমানুষ, ঐ জগদ্দল দরজা খোলা কি আমার কাজ।

গোকুলদাস মুক্তকচ্ছভাবে ছুটিয়া গিয়া লোহার দরজার হুড়কা খুলিতে খুলিতে চেঁচাইতে লাগিলেন,

গুণ্ডার বাচ্চা পালিয়েছে–পাকড়ো পাকড়ো–ফটক বন্ধ করো—

.

জানালার নীচে মোরহরভরা থলি দুটি পড়িয়াছিল। প্রতাপ দেয়াল বাহিয়া নামিয়া আসিয়া থলি দুটি মুঠ ধরিয়া দুহাতে তুলিয়া লইল।

সিংদরজার প্রহরীরা থলি পতনের শব্দে জাগিয়া উঠিয়াছিল। শব্দটা তাহাদের সন্দেহজনক বলিয়া মনে হইয়াছিল, তাই তাহারা উঠিয়া কবাটের তালা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশপূর্বক অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, ক্রমে পুরীর সকলে জাগিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু জানালার নীচে পতিত থলি দুটা কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই।

সিংদরজার কবাট খোলা রহিয়াছে কিন্তু সেখানে কেহ নাই। প্রতাপ শিকারী শ্বাপদের মত নিঃশব্দে পা ফেলিয়া সেইদিকে চলিল। খিড়কি দরজার বাহিরে মোতি আছে কিন্তু সেদিকে যাওয়া আর নিরাপদ নয়, চারিদিক হইতে সজাগ মানুষের হাঁক-ডাক আসিতেছে।

সিংদরজায় পৌঁছিতে প্রতাপের আর কয়েক পা বাকি আছে এমন সময় বাড়ির কোণ ঘুরিয়া এক দল লাঠি-সড়কিধারী লোক আসিয়া পড়িল— তাহাদের আগে আগে কান্তিলাল। প্রতাপকে দেখিয়াই তাহারা হৈ হৈ করিয়া ছুটিয়া আসিল, সঙ্গে সঙ্গে জানালা হইতে গোকুলদাসের তীক্ষ্ণ তারস্বর শোনা গেল

ধর ধর—ঐ পালাচ্ছে।

প্রতাপ তীরবেগে সিংদরজা দিয়া বাহির হইয়া দক্ষিণদিকে ছুটিয়া চলিল। ঐ দিকে মোতি আছে; যদি সে কোনও রকমে একবার মোতির পিঠে চড়িয়া বসিতে পারে তবে আর তাহাকে ধরে কে? কিন্তু কান্তিলাল ও তাহার সহচরেরাও দৌড়ে কম পটু নয়, তাহারা সবেগে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছে। বিশেষত একটা লোক এত বেগে ছুটিয়া আসিতেছে যে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল বলিয়া।

দুই হাতে ভারী দুটি থলি, সুতরাং প্রতাপ অতি দ্রুত ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিল; অবশেষে পলায়নের আর কোনও উপায় না দেখিয়া সে হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল। যে লোকটা সর্বাগ্রে তাড়া করিয়া আসিতেছিল, সে নাগালের মধ্যে আসিতেই প্রতাপ ডান হাতের থলিটি

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

ঘুরাইয়া গদার মত তাহার মস্তকে প্রহার করিল। লোকটা আর্তনাদ করিয়া সেইখানে মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেল। কিন্তু সেই সঙ্গে মোহরের থলি ফাটিয়া গিয়া চারিদিকে মোহর ছড়াইয়া পড়িল। প্রতাপ আর সেখানে দাঁড়াইল না, আবার দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ দৌড়াইয়া সে একবার পিছু ফিরিয়া দেখিল, কেহ তাহাকে তাড়া করিয়া আসিতেছে কিনা। সে দেখিল তাহার পশ্চাদ্ধাবনকারীরা সকলেই মাটিতে হামাগুড়ি দিয়া ও পরস্পর কাড়াকাড়ি করিয়া মোহর কুড়াইতেছে। প্রতাপ তখন দৌড়াইতে দৌড়াইতে ডাকিতে লাগিল,-

মোতি—মোতি–

তাহার কণ্ঠস্বরে কান্তিলাল ও অনুচরগণের হুঁশ হইল যে চোর পলাইতেছে, তখন তাহারা উঠিয়া আবার তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল।

কিন্তু চোরকে তাহারা ধরিতে পারিল না। প্রভুর আহ্বান মোতির কানে গিয়াছিল; সে ক্ষণেক উৎকর্ণ থাকিয়া সহসা হ্রেষাধ্বনি করিয়া প্রভুর কণ্ঠস্বর অনুসরণপূর্বক দৌড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিল। প্রতাপ শুনিল পিছনে মোতির ক্ষুরধ্বনি অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। সে আবার ডাকিল,

মোতি! মোতি! আয় বেটা!

মোতির ক্ষুরধ্বনি আরও স্পষ্ট হইতে লাগিল। সে পশ্চাদ্ধাবনকারীদের ছাড়াইয়া প্রতাপের পাশে পৌঁছিল। দুজনে পাশাপাশি দৌড়াইতেছে। তারপর প্রতাপ একলম্ফে ধাবমান মোতির পিঠে চড়িয়া বসিল।

কান্তিলাল ও তাহার সাঙ্গোপাঙ্গ থ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; বেগবান্ অশ্ব ও আরোহী জ্যোৎস্নাকুহেলির মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

.

রাত্রি তৃতীয় প্রহর। চাঁদ পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছে।

জলসত্রের প্রকোষ্ঠে চিন্তা ঝুলার উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ঘুমের মধ্যেও বোধ করি প্রতাপের কথা তাহার মন জুড়িয়াছিল— ঠোঁট দুটি অল্প-অল্প স্ফুরিত হইতেছিল। অবহেলা-ম্লান মালা দুটি বুকের কাছে গুচ্ছাকারে পড়িয়া তাহার তপ্ত নিশ্বাসের সহিত নিজের ব্যর্থ সুগন্ধ মিশাইতেছিল।

সহসা অর্গলবদ্ধ দ্বারে করাঘাত হইল। চিন্তা চমকিয়া চক্ষু মেলিল, ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বিস্ফারিত নেত্রে ঘরের পানে চাহিয়া রহিল।

আবার দ্বারে করাঘাত হইল। চিন্তা নিঃশব্দে উঠিল; দ্বারের পাশে একটি ঝকঝকে ধারালো কাটারি ঝুলিতেছিল, সেটি দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া কড়া সুরে প্রশ্ন করিল,-

কে তুমি?

বাহির হইতে চাপা গলায় আওয়াজ আসিল—

চিন্তা, দোর খোলো– আমি প্রতাপ

তাড়াতাড়ি কাটারি রাখিয়া চিন্তা দ্বারের হুড়কা খুলিতে প্রবৃত্ত হইল—

তুমি তুমি এত রাত্রে—

দ্বার খুলিতেই প্রতাপ ভিতরে প্রবেশ করিল। কপালে ঘাম, চুলের উপর ধূলা পড়িয়াছে, চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, তাহার মূর্তি দেখিয়া চিন্তা শঙ্কা-বিস্ময়ে তাহার বুকের কাছে সরিয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল,-

এ কি—কী হয়েছে?

প্রতাপ প্রথমে দ্বারের অর্গল বন্ধ করিয়া দিল; তারপর চিন্তার দিকে ফিরিয়া তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া ভগ্নস্বরে বলিল,-

চিন্তা, কাল তোমার সঙ্গে দেখা হবার পর আমার দুনিয়া ওলট-পালট হয়ে গেছে। আমি এখন সমাজের বাইরে ডাকাত–বারবটিয়া

চিন্তা সত্রাসে প্রতিধ্বনি করিল,

ডাকাত! বারবটিয়া! কেন, কি করেছ তুমি?

প্রতাপ মোহরের থলি চিন্তার হাতে দিয়া ক্লান্ত হাসিল, তারপর ঝুলার উপরে গিয়া বসিল। —

বলছি। কিন্তু বেশী সময় নেই, এতক্ষণে আমার নামে হুলিয়া বেরিয়ে গেছে, সকাল হবার আগেই পালাতে হবে—

চিন্তা ঝুলার পাশে নতজানু হইয়া ব্যাকুলস্বরে বলিয়া উঠিল,

ওগো, কী হয়েছে সব আমায় বল।

বলব। তার আগে তোমার কর্তব্য কর।

কর্তব্য?

সূচিপত্র

পানিহারিন, পিপাসার্ত পথিককে আগে একটু জল দাও।

ত্বরিতে জলভরা ঘটি আনিয়া চিন্তা প্রতাপের হাতে দিল। প্রতাপ ঊর্ধ্বমুখ হইয়া ঘটির জল গলায় ঢালিয়া দিতে লাগিল।

ওদিকে পরপের বাহিরে মোতি দাঁড়াইয়াছিল, তাহার মুখের লাগাম একটি খুঁটিতে বাঁধা ছিল। মোতি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার কান পর্যন্ত নড়িতেছিল না। প্রয়োজন হইলে সে এমনি নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে–যেন পাথরে কোঁদা মুর্তি।

অদূরে ঝোপের আড়াল হইতে একটি মুণ্ড গলা বাড়াইয়া উঁকি মারিল। তাহার দৃষ্টি মোতির দিকে। কিছুক্ষণ একাগ্রদৃষ্টিতে মোতিকে নিরীক্ষণ করিয়া সে নিঃশব্দে ঝোপের আড়াল হইতে বাহির হইয়া আসিল। চাঁদের আলোয় লোকটিকে পরিষ্কার দেখা গেল— চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সের একটি ক্ষীণকায় দীর্ঘগ্রীবা যুবক। তাহার মুখে ধূর্ততা মাখানো, পাতলা গোঁফজোড়া সর্বদাই খরগোশের গোঁফের মত অল্প অল্প নড়িতেছে। সে মোতির উপর অবিচলিত দৃষ্টি রাখিয়া এক পা এক পা করিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। যুবকের ভাবভঙ্গি দেখিয়া মোতি সম্বন্ধে তাহার মনোভাব সততার পরিচায়ক বলিয়া মনে হয় না।

.

ইত্যবসরে ঘরের মধ্যে প্রতাপ ও চিন্তা পাশাপাশি ঝুলার উপর বসিয়াছে, প্রতাপ তাহার কাহিনী বলা শেষ করিয়াছে। চিন্তার চোখে জল, সে দুই হাতে প্রতাপের একটি হাত শক্ত করিয়া ধরিয়া আছে।

প্রতাপ বলিল,-সব তো শুনলে। আমি আমার রাস্তা বেছে নিয়েছি। এখন তুমি কি করবে বল।

চিন্তা বলিল,-তুমি যা বলবে তাই করব। – আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে চল—

নিশ্বাস ফেলিয়া প্রতাপ মাথা নাড়িল।

তা হয় না, আমার সঙ্গে তুমি থাকলে–

চিন্তা বলিল,-আমার কষ্ট হবে ভাবছ? তুমি সঙ্গে থাকলে আমি সব কষ্ট সহ্য করতে পারব।

প্রতাপ বলিল,-আমি তা জানি চিন্তা। সে জন্যে নয়। তবে বলি শোন। আমি এখন ডাকাত বারবটিয়া, মানুষের সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশার উপায় আর আমার নেই। পাহাড়ে গুহায় জঙ্গলে লুকিয়ে লুকিয়ে আমায় জীবন কাটাতে হবে। অথচ শহরে বাজারে মহাজনদের মহলে কোথায় কি ঘটছে তার খবর না জানলেও আমার কাজ চলবে না।

মেঘনাদের মত মেঘের আড়ালে লুকিয়ে আমাকে এই অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে চিন্তা।

চিন্তা বলিল,-তবে আমাকে কি করতে হবে হুকুম দাও।

প্রতাপ বলিল,-তোমাকে কিছুই করতে হবে না। তুমি যেমন প্রপাপালিকা আছ তেমনি থাক।

আমি তোমার কোনও কাজই লাগব না?

তুমি হবে আমার সব চেয়ে বড় সহকারিণী। তোমার সঙ্গে আমার কী সম্বন্ধ তা কেউ জানে না। তুমি এখানে যেমন আছ তেমনি থাকবে। এই পথ দিয়ে কত লোক আসে যায়, তাদের মুখে অনেক টুকরো-টাকরা খবর তুমি পাবে। এই সব খবর তুমি আমার জন্যে সঞ্চয় করে রাখবে। আমি মাঝে মাঝে লুকিয়ে এসে তোমার সঙ্গে দেখা করব আর দুনিয়ার খবর নিয়ে যাব।

চিন্তা কিয়ৎকাল নীরব হইয়া রহিল, প্রস্তাবটা প্রথমে তাহার মনঃপূত হয় নাই, কিন্তু ক্রমে তাহার সংশয় কাটিয়া গিয়া মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

বেশ, তাই ভাল। তবু তো মাঝে মাঝে তোমায় চোখে দেখতে পাব।

প্রতাপ চিন্তাকে কাছে টানিয়া লইয়া গাঢ়স্বরে বলিল,–

চিন্তা, আজ পৃথিবীতে তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই তোমাকে এখানে ফেলে রেখে চলে যাওয়া যে কত মর্মান্তিক তা তো তুমি বুঝতে পারছ? কোথায় ভেবেছিলাম তোমাকে বিয়ে করে সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটাব

চিন্তা অবহেলা-ম্লান মালা দুটি ঝুলার উপর হইতে তুলিয়া লইল; একটি মালা প্রতাপের হাতে দিয়া অন্যটি তাহার গলায় পরাইয়া দিল, গম্ভীর শান্ত চক্ষে চাহিয়া বলিল,-

এই আমাদের বিয়ে। ভগবান যদি দিন দেন তখন সুখে-স্বচ্ছন্দে তোমার ঘর করব।

চিন্তার গলায় হাতের মালা পরাইয়া দিয়া প্রতাপ তাহার দুই হাত ধরিয়া গভীর আবেগভরে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল—

চিন্তা

এই সময় দ্বারে খুটখুট করিয়া শব্দ হইল। প্রতাপের কথা শেষ হইল না, তাহাদের দুইজোড়া সন্ত্রস্ত চক্ষু দ্বারের উপর গিয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ নীরব; তারপর বাহিরে হইতে একটি করুণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল—

ও মশায় ঘোড়ার মালিক, একবার দয়া করে বাইরে আসবেন কি?

কণ্ঠস্বরের কাতরতা আশ্বাসজনক। তবু কিছুই বলা যায় না। প্রতাপ ও চিন্তা দৃষ্টি বিনিময় করিল। প্রতাপ কোমর হইতে একটি পিস্তল বাহির করিয়া নিঃশব্দে দ্বারের কাছে গিয়া কান পাতিয়া শুনিল, তারপর হঠাৎ দ্বার খুলিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান লোকটির বুকের উপর পিস্তল ধরিয়া কর্কশস্বরে বলিল,-

কি চাও? কে তুমি?

অতর্কিত আক্রমণে লোকটি প্রায় উটিয়া পড়িয়া যাইতেছিল, কোনও রকমে সালাইয়া লইল। সে আর কেহ নয়, সেই ক্ষীণকায় যুবক। চক্ষু চক্রাকার করিয়া সে প্রতাপের পানে ও পিস্তলটার পানে পর্যায়ক্রমে তাকাইয়া শেষে বলিল,-

ওটা সরিয়ে নিলে ভাল হয়— আমি কিঞ্চিৎ ভয় পেয়েছি।

প্রতাপ পিস্তল নামাইল না, চিন্তাকে ডাকিয়া বলিল,–

চিন্তা, প্রদীপটা নিয়ে এস।

প্রদীপ হাতে লইয়া চিন্তা প্রতাপের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রতাপ এখন লোকটিকে ভাল করিয়া দেখিল–সম্পূর্ণ নিরস্ত্র এবং দৈহিকশক্তির দিক দিয়াও উপেক্ষণীয়। লোকটিও

ইহাদের দুজনকে দেখিয়া বুঝিয়া লইল যে ইহারা গুপ্তপ্রণয়ী; সে একটু লজ্জার ভান করিয়া ঘাড় চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল,-

এ হে হে—আমি দেখছি কিঞ্চিৎ দোষ করে ফেলেছি— এমন চাঁদনী রাত্রে প্রণয়ীদের মিলনে বাগড়া দেওয়া—কিঞ্চিৎ

প্রতাপ প্রশ্ন করিল,—তুমি কে?

যুবক করুণভাবে বলিল, বলতে নেই আমার অবস্থাও প্রায় একই রকম। মামুদপুরের বড় মহাজন রতিলাল শেঠের মেয়ের সঙ্গে কিঞ্চিৎ প্রেম হয়েছিল, লুকিয়ে লুকিয়ে দেখাশুনা হচ্ছিল, হঠাৎ বাগড়া পড়ে গেল। সবাই মার মার করে তেড়ে এল। কাজেই এখন আমি পলাতক—ফেরারী আসামী।

প্রতাপ ও চিন্তার মধ্যে চকিত দৃষ্টি বিনিময় হইল।

প্রতাপ বলিল,–তুমিও ফেরারী?

প্রতাপ ও চিন্তা বারান্দায় বাহির হইয়া আসিল।

যুবক বলিল,—ফেরারী না হয়ে উপায় কি? রতিলাল শেঠ কিঞ্চিৎ কড়া-পিত্তির লোক, ধরতে পারলে কোনও কথা শুনত না, সটান টাঙিয়ে দিত। তাই পলায়নের রাস্তা যতদুর সুগম করা যায় তারই চেষ্টায় আছি। আপনার ঘোড়াটি—

যুবক লোলুপ দৃষ্টিতে মোতির পানে ফিরিয়া চাহিল।

প্রতাপ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল,-আমার ঘোড়া? মোতি?

যুবক বলিল, এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম ঘোড়াটি চোখে পড়ল। তা ভাবলাম ঘোড়ার মালিক নিশ্চয় কাছেপিঠে আছেন, তিনি যদি ঘোড়াটি উচিত মূল্যে বিক্রি করেন তাহলে আমার কিঞ্চিৎ উপকার হয়।

বিক্রি করব? মোতিকে বিক্রি করব!

যুবক বলিল,-দেখুন, আমি বড়লোক নই কিন্তু গরজ বড় বালাই। আপনাকে না হয় উচিত মূল্যের কিঞ্চিৎ বেশীই দেব।

প্রতাপ একটু হাসিল, এই কৌতুকপ্রিয় অথচ কূটবুদ্ধি যুবকটিকে তাহার ভাল লাগিল। বিপদের মুখেও যাহার মন হইতে হাস্যরস মুছিয়া যায় না তাহার ভিতরে পদার্থ আছে। প্রতাপ প্রশ্ন করিল,-

তোমার নাম কি?

যুবক সবিনয়ে উত্তর দিল,

বলতে নেই আমার নাম ভীমভাই অর্জুনভাই শিয়াল।

প্রতাপ বলিল,-একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমার ঘোড়াটি একলা পেয়ে তুমি চুরি করলে না কেন?

ভীমভাই একটু সলজ্জ হাসিল। তাহার গোঁফজোড়া নড়িতে লাগিল—

বলতে নেই সে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আপনার ঘোড়াটি কিঞ্চিৎ বেশী প্রভুভক্ত, লাগামে হাত দিতেই ঘ্যাঁক করে কামড়ে দিল। এই দেখুন।

ভীমভাই হাত বাহির করিয়া দেখাইল; হাতের পোঁচায় ঘোড়ার দাঁতের দাগ রহিয়াছে, তবে রক্তপাত হয় নাই।

ভীমভাই বলিল,—এখন ফেরারী আসামীর প্রতি দয়া করে ঘোড়াটি বিক্রি করবেন কি?

প্রতাপ বলিল,-মোতিকে কিনতে পারে এত টাকা কাথিয়াবাড়ে নেই। তাছাড়া আমিও তোমার মত ফেরারী, মহাজনের টাকা লুঠ করেছি।

ভীমভাই বিপুল বিস্ময়ে হাঁ করিয়া কিছুক্ষণ প্রতাপের মুখের পানে চাহিয়া রহিল

বলতে নেই কিঞ্চিৎ রোমহর্ষণ ব্যাপার মনে হচ্ছে আমিও ফেরারী, আপনিও ফেরারী। এমন যোগাযোগ বলতে নেই সহজে ঘটে না।

প্রতাপ পিস্তল কোমরে রাখিয়া ভীমভাইয়ের কাঁধের উপর হাত রাখিল, মর্মভেদী দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া শেষে বলিল,-

ভীমভাই, তোমার মত মানুষ আমার দরকার। তুমি আসবে আমার সঙ্গে?

ভীমভাই প্রশ্ন করিল,—বলতে নেই—কোথায়?

প্রতাপ বলিল,-তোমার আমার জন্যে কেবল একটি পথ খোলা আছে, ডাকাতির পথ, বারবটিয়ার পথ। আসবে এ পথে?

মহানন্দে ভীমভাই প্রতাপকে একেবারে জড়াইয়া ধরিল।

আসব না? বলতে নেই আসব না তো যাব কোথায়? আজ থেকে তুমি আমার গুরু আমার সর্দার।

প্রতাপ ভীমের আলিঙ্গন মুক্ত হইল। বলিল,–

আজ আমাদের নবজীবনের ভিত্তি হল। চিন্তা, আজ আমার মাত্র তিনজন বিদ্রোহী দুর্গম পথে যাত্রা শুরু করলাম। ক্রমে আমাদের দল বেড়ে উঠবে দেশে বিদ্রোহীর অভাব নেই। ভীমভাই, আমরা তিনজন মিলে যে আগুন জ্বালব

ভীমভাই বলিল,-তিনজন নন—চারজন। বলতে নেই আমার একটি সাথী আছে—

সাথী? কই কোথায়?

অবস্থাগতিকে কিঞ্চিৎ আড়ালে আছে। এই যে ডাকছি।

ভীমভাই মুখের মধ্যে দুইটি আঙুল পুরিয়া দিয়া তীব্র শিস্ দিল, তারপর ডাকিল,–

তিলু। তিলোত্তমা।

যে ঝোপের আড়াল হইতে কিছুকাল পুর্বে ভীমভাই উঁকি মারিয়াছিল, তাহার পিছন হইতে একটি হাস্যমুখী তরুণী বাহির হইয়া আসিল। পরিধানে ঘাগরা ও ওড়নি, হাতে একটি ছোট্ট পুঁটুলি, তিলোত্তমা দৌড়িয়া আসিয়া ভীমভাইয়ের পাশে দাঁড়াইল।

ভীমভাই বলিল,-তিলু, আজ থেকে আমরা ডাকাত-গলার মধ্যে হুঙ্কার শব্দ করিল) ইনি আমাদের সর্দার।

তিলুর চোখ দুটি ভারি চঞ্চল আর দাঁতগুলি মুক্তাশ্রেণীর মত উজ্জ্বল, সে চঞ্চল কৌতুকভরা চক্ষে চিন্তা ও প্রতাপকে নিরীক্ষণ করিয়া দশনচ্ছটা বিচ্ছুরিত করিয়া হাসিল। প্রতাপ সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল,-

ইনি কে ভীমভাই?

ভীমভাই বলিল,—চিনতে পারলে না সর্দার? বলতে নেই রতিলাল শেঠের মেয়ে তিলু। কিঞ্চিৎ একগুঁয়ে মেয়ে, কিছুতেই শুনল না, আমার সঙ্গে পালাল। ওর জন্যেই তো আমার এই সর্বনাশ।

প্রতাপ স্মিতমুখে চিন্তার পানে চাহিল। তিলু কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। চিন্তা প্রদীপ রাখিয়া হাসিতে হাসিতে গিয়া তিলুকে জড়াইয়া লইল।

.

ভোর হইতে আর বেশী দেরি নাই। চন্দ্র অস্ত যাইতেছে। থাকিয়া থাকিয়া দুএকটা কোকিল কুহরিয়া উঠিতেছে।

জলসত্রের সম্মুখে পথের উপর মোতি দাঁড়াইয়া। তাহার পিঠের উপর সারি দিয়া তিনজন আরোহী : সর্বাগ্রে প্রতাপ লাগাম ধরিয়া বসিয়া আছে, তাহার পিছনে ভীমভাই প্রতাপের কাঁধে হাত দিয়া বসিয়া আছে, সর্বশেষে তিলু একহাতে ভীমভাইয়ের কোমর জড়াইয়া তাহার পিঠের উপর গাল রাখিয়া পরম সুখে মৃদু মৃদু হাসিতেছে। তিলু ও ভীমভাইয়ের গলায় বনফুলের মালা দুটি ইতিমধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহারাও এখন গন্ধর্বমতে বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী।

চিন্তা পথের উপর দাঁড়াইয়া তাহাদের বিদায় দিতেছে। কোনও কথা হইল না, প্রতাপ একবার ঘাড় ফিরাইয়া চিন্তার পানে চাহিয়া একটু হাসিল। তারপর তাহার বলগার ইশারা পাইয়া মোতি ধীর পদে পাহাড়ের অভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিল।

3

এক শহরের একটি প্রাচীর-গাত্রে বেশ বড় গোছের একটি ইস্তাহার আঁটা রহিয়াছে

১০০০ টাকা পুরস্কার।
বারবটিয়া প্রতাপ সিংকে
যে-কেহ রাজসকাশে ধরাইয়া দিতে পারিবে
সে এক হাজার টাকা পুরস্কার পাইবে।

ইস্তাহারের ঠিক পাশেই একটি দারুনির্মিত পায়রার খোপের মত ক্ষুদ্র পানের দোকান। দোকানদার দোকানের মধ্যে বসিয়া পান সাজিতেছে, সম্মুখে দুইজন গ্রাহক দাঁড়াইয়া পান কিনিতেছে।

একজন খরিদ্দার ইস্তাহারটি দেখিয়া দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিল,–

ইস্তাহারে কী লেখা রয়েছে?

দোকানদার পানের খিলি খরিদ্দারকে দিয়া নীরসকণ্ঠে বলিল,–

লেখা আছে, প্রতাপ বারবটিয়াকে যে ধরিয়ে দিতে পারবে সে হাজার টাকা ইনাম পাবে।

লোকটি পান চিবাইতে চিবাইতে কিছুক্ষণ বিরাগপুর্ণ নেত্রে ইস্তাহারটি নিরীক্ষণ করিল, তারপর ঘৃণাভরে ইস্তাহারের উপর পানের পিক ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় খরিদ্দারটি শীর্ণাকৃতি এবং অপেক্ষাকৃত ভীরু প্রকৃতির। সে পান মুখে দিয়া একবার সতর্কভাবে এদিক ওদিক তাকাইল, তারপর হঠাৎ ইস্তাহারের উপর পিচকারীর বেগে পিক ফেলিয়া দ্রুত প্রস্থান করিল।

দোকানদার একটু গম্ভীর হাসিল। সে আর কেহ নয়, বৃদ্ধ লছমন।

.

আর একটি শহর। একটা তকমাধারী লোক ঢোল পিটাইয়া রাস্তায় রাস্তায় হুলিয়া দিয়া বেড়াইতেছে।

সরকারী পুরস্কার বাড়িয়ে দেওয়া হল— শোনো সবাই দেশের শত্রু সমাজের শত্রু রাজার শত্রু প্রতাপ বারবটিয়াকে যে ধরিয়ে দিতে পারবে সে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার পাবে

একটা গলির মোড়ে কয়েকজন বালক দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদের মধ্যে একজনের হাতে গুলতি। বালক গুলতিতে একটি প্রস্তরখণ্ড বসাইয়া লক্ষ্য স্থির করিয়া ছুঁড়িয়া মারিল। তারপর বালকের দল হৈ হৈ করিতে করিতে ছুটিয়া পলাইল।

তকমাধারী ঘোষক ঘোষণা শেষ করিয়া ঢোলে কাঠি দিতে গিয়া দেখিল ঢোল ফাঁসিয়া গিয়াছে। রাস্তার লোক বিদ্রূপভরে হাসিয়া উঠিল।

চিন্তার জলসত্রে অসমতল দেয়ালে একটি ইস্তাহার আঁটা রহিয়াছে—

১০০০ টাকা

প্রতাপ বারবটিয়াকে যে-কেহ ইত্যাদি।

প্রতাপ দাঁড়াইয়া এক টুকরা কয়লা দিয়া পুরস্কারের অঙ্কের পিছনে আরও কয়েকটা শূন্য যোগ করিয়া দিতেছে। তাহার মুখে মৃদু ব্যঙ্গ-হাসি।

পায়রার বকবকম শব্দ শুনিয়া প্রতাপ উর্ধ্বে চক্ষু তুলিল। একটি দীর্ঘ বংশদণ্ডের আগায় কঞ্চির কামানি দিয়া ছত্র রচনা হইয়াছে, তাহার উপর দুটি কপোত। প্রতাপ যে কপোতশিশু দুটি চিন্তাকে উপহার দিয়াছিল, তাহারা আর শিশু নহে, সাবালক ও স-পালক হইয়াছে।

তাহাদের দিকে চাহিয়া প্রতাপের মুখের ব্যঙ্গ হাসি স্নেহে কোমল হইয়া আসিল। এই সময় চিন্তা ঘরের ভিতর হইতে বারান্দায় আসিয়া উদ্বিগ্নস্বরে বলিল,-

ও কি, সদরে দাঁড়িয়ে আছ? কেউ যদি এসে পড়ে! মোতি কোথায়?

প্রতাপ বলিল,-মোতিকে ওদিকে লুকিয়ে রেখেছি, কেউ দেখতে পাবে না।

চিন্তা বলিল,-তবে ওখানে দাঁড়িয়ে কি কাজ? এস, ভেতরে এস, তোমার খাবার দিয়েছি

প্রতাপ আসিয়া বারান্দায় চিন্তার সহিত যোগ দিল, বলিল— চুনি-মুনিকে দেখছিলাম। ওদের যখন বাসা থেকে তুলে এনেছিলাম তখন কে ভেবেছিল ওরা এত কাজে লাগবে।

চিন্তা বলিল,-আমাদের ভাগ্যবিধাতা জানতেন, তাই আগে থেকে আয়োজন করে রেখেছিলেন।

প্রতাপ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল মেঝেয় পিঁড়ি পাতা হইয়াছে, সম্মুখে প্রকাণ্ড পিতলের থালি; থালিতে নানাপ্রকার অন্নব্যঞ্জন সজ্জিত রহিয়াছে : গমের ফুলকা রুটি, শিং দিয়া তুরের ডাল (সজিনার ডাটা (শিং) দিয়া অড়র ডাল); মুঠিয়া পকৌড়া, ধোকড়া, দহিবড়া, শ্রীখণ্ড–আরও কত কি। প্রতাপ সহর্ষে পিঁড়ির উপর বসিল।

ভাগ্যবিধাতা আমার জন্যেও আজ কম আয়োজন করেননি—

প্রতাপ পরম আগ্রহে আহার আরম্ভ করিল, চিন্তা সলজ্জ তৃপ্তির সহিত বসিয়া দেখিতে লাগিল।

রান্না ভাল হয়েছে?

প্রতাপ বলিল, ভাল? অমৃত। সত্যিই বলছি চিন্তা, ডাকাত হবার আগে যদি তোমার রান্না খেতাম তাহলে হয়তো

বলিতে বলিতে সে থামিয়া গেল, তাহার কৌতুক-চটুল মুখ সহসা গম্ভীর হইল। সে হাতের অর্ধভুক্ত ধোকড়া নামাইয়া রাখিল।

চিন্তা বলিল,-কি হল?

প্রতাপ বলিল,-কিছু না। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আমি এখানে বসে দিব্যি চর্বচোষ্য খাচ্ছি, আর ওরা—ভীম নানা প্রভু তিল–নুন দিয়ে বাজরি রুটি চিবচ্ছে।

চিন্তা ঈষৎ হাসিয়া বলিল,-তা হোক— তুমি খাও।

প্রতাপ বিষণ্নমুখে উঠিবার উপক্রম করিল—

না চিন্তা, এত ভাল খাবার আর আমার গলা দিয়ে নামবে না।

উঠো না, উঠো না। ওদের জন্যেও আমি খাবার তৈরি রেখেছি-তুমি নিয়ে যাবে। ঐ দ্যাখো।

ঘরের কোণে একটি আধমনী চটের থলি আভ্যন্তরিক পরিপূর্ণতায় পেট ফুলাইয়া ধনী মহাজনের মত বসিয়া ছিল, দেখিয়া প্রতাপের মুখ আবার প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সে কৃতজ্ঞতা-তদগত স্বরে চিন্তাকে বলিল,-

চিন্তা, তুমি একটি আস্ত জলজ্যান্ত দেবী—এতে কোনও সন্দেহ নেই।

প্রতাপ আহারে মন দিল। এই সময় পায়রা দুটি উড়িয়া আসিয়া জানালায় বসিল। চিন্তা একমুঠি শস্য লইয়া মেঝেয় ছড়াইয়া দিল, চুনি-মুনি অমনি নামিয়া আসিয়া দানাগুলি খুঁটিয়া খাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ নীরব আহারে কাটিল।

প্রতাপ জিজ্ঞাসা করিল,-খবর কিছু আছে নাকি?

চিন্তা কহিল,-না, নতুন খবর কিছু পাইনি।

আমি বোধ হয় এখন কিছুদিন আর আসতে পারব না। যদি জরুরী খবর কিছু পাও— প্রতাপ অর্থপূর্ণভাবে চুনি-মুনির পানে তাকাইল।

চিন্তা ঘাড় নাড়িয়া বলিল,-হ্যাঁ।

সহসা বাহিরে ডুলি বাহকের হুহুম্ শব্দ শোনা গেল। প্রতাপ ও চিন্তা সচকিত মুখ তুলিল।

.

বাহিরে রাস্তার উপর শেঠ গোকুলদাসের ডুলি আসিয়া থামিয়াছে। এবার সঙ্গে রক্ষীর সংখ্যা বেশী, কান্তিলাল ও পাঁচজন বন্দুকধারী সিপাহী। হতভাগা প্রতাপ সিং ধরা না পড়া পর্যন্ত মহাজন সম্প্রদায়কে সাবধানে পথ চলিতে হয়।

গোকুলদাস ডুলি হইতে মুণ্ড বাহির করিয়া হাঁকিলেন,

ওরে, জল নিয়ে আয়।

ঘরের মধ্যে চিন্তা ও প্রতাপ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। চিন্তা পাণ্ডুমুখে প্রতাপের পানে চাহিয়া নিঃশব্দে অধরোষ্ঠের সঙ্কেতে বলিল,-গোকুলদাস।

আকস্মিক বিপদের সম্মুখীন হইয়া প্রতাপের চক্ষু প্রখর হইয়া উঠিল, সে চিন্তাকে কাছে টানিয়া বলিল,-

যাও, ওদের জল দাও গিয়ে, ভয় পেয়ো না। যদি জিজ্ঞাসা করে বোলো ঘুমিয়ে পড়েছিলে—

বাহির হইতে গোকুলদাসের স্বর আসিল

আরে কোথায় গেল পরপওয়ালী ছুঁড়িটা? কাজের সময় হাজির থাকে না! কান্তিলাল, দ্যাখ তো ঘরে আছে কিনা।

চিন্তার হাত-পা ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু আর বিলম্ব করিলে সর্বনাশ। সে কোনও ক্রমে মুখে একটু ঘুম-ঘুম ভাব আনিয়া ঘর হইতে বাহির হইল।

কান্তিলাল ঘরের দিকে আসিতেছিল, চিন্তাকে জলের ঘটি লইয়া বাহির হইতে দেখিয়া আর অগ্রসর হইল না। আকর্ণ দন্ত বাহির করিয়া হাসিল, বলিল,-

এই যে ধনী বেরিয়েছেন!

চিন্তা গোকুলদাসের সম্মুখীন হইতেই তিনি বিষাক্ত চক্ষে তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন,–

কোথায় ছিলি? সরকারে পগার (মাসিক বেতন) নিস্ না তুই; কাজে হাজির থাকি না কেন?

চিন্তা জড়িতকণ্ঠে বলিল,-ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—

গোকুলদাস বিকৃতমুখে বলিলেন, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম! কেন? রাত্তিরে ঘুমোস না?

কান্তিলাল চোখ টিপিয়া টিপ্পনি কাটিল,–

রাত্তিরে ঘুম হবে কোত্থেকে শেঠ? রাত্তিরে বোধ হয় নাগর আসে।

কান্তিলালের সহচরেরা এই রসিকতায় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ঘরের মধ্যে প্রতাপ সবই শুনিতে পাইতেছিল, অসহায়-ক্রোধে তাহার চক্ষু জ্বলজ্বল করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

গোকুলদাস মুখের কাছে গণ্ডুষ করিয়া জল পান করিলেন, তারপর মুখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন,-

ঠিক বলেছিস কান্তিলাল, ছুঁড়ি রাত্তিরে ঘরে নাগর আনে। রাজপুতের মেয়ে আর কত ভাল হবে?

রাজপুতের প্রতি বিদ্বেষ প্রতাপ ঘটিত ব্যাপারের পর হইতে গোকুলদাসের মনে শতগুণ বাড়িয়া গিয়াছিল। তাঁহার এই নীচ অপমানে চিন্তার মুখ একেবারে সাদা হইয়া গেল, কিন্তু সে অধর দংশন করিয়া নীরব রহিল। প্রভুর অনুমোদন পাইয়া কান্তিলাল সোৎসাহে বলিল,-

শুধু রাত্তিরে কেন শেঠ, দিনের বেলাও আনে। এখন হয়তো ঘরের মধ্যে নাগর লুকিয়ে আছে।–উঁকি মেরে দেখে আসব?

ঘরের মধ্যে প্রতাপের সমস্ত শরীর শক্ত হইয়া উঠিল, সে দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া কোমর হইতে পিস্তল বাহির করিল। যদি ধরা পড়িতেই হয়, ঐ নরপশুটাকে সে আগে শেষ করিবে।

শেঠ কিন্তু আর কালক্ষয় করিলেন না, বলিলেন,

না থাক। রাজপুতনী দশটা নাগর ঘরে আনুক না, আমার তাতে কি? নে ডুলি তোল, বেলা থাকতে থাকতে পৌঁছুতে হবে।

বাহকেরা ডুলি তুলিয়া চড়াইয়ের পথে যাত্রা করিল। কান্তিলাল চিন্তার পাশ দিয়া যাইবার সময় খাটো গলায় বলিয়া গেল,-

আমিও এবার একদিন রাত্তিরে আসব

চিন্তা অপমান লাঞ্ছিত মুখে চুপ করিয়া রহিল।

ঘরের মধ্যে প্রতাপ জালবদ্ধ শ্বাপদের মত ছটফট করিতেছিল, কিন্তু ফিরিয়া আসিতেই তাহার দুই কাঁধে হাত রাখিয়া আগুনভরা চোখে চাহিল

চিন্তা। এই সব অপমান তোমাকে সহ্য করতে হয়?

চিন্তা একটা দীর্ঘ কম্পিত নিশ্বাস ফেলিয়া ক্ষণেকের জন্য মুখ নিচু করিল। তারপর পাণ্ডুর হাসিয়া আবার মুখ তুলিল

ও কিছু নয়। কিন্তু তুমি আর দিনের বেলা এস না। আর একটু হলেই আজ

চিন্তা এতক্ষণ কোনও ক্রমে আত্মসংবরণ করিয়াছিল কিন্তু আর পারিল না, হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া সে প্রতাপের বুকের উপর মুখ ঢাকিল। ভয়, অপমান ও সর্বশেষে বিপন্মুক্তির আকস্মিক অব্যাহতি মিলিয়া তাহার স্নায়ুমণ্ডলে যে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাই দুর্নিবার অশ্রুধারায় বিগলিত হইয়া পড়িল।

.

বিস্তীর্ণ গিরিকান্তারের একটি দৃশ্য। পাহাড়ের ভাগই বেশী। নিরাবরণ পাথরের বিশৃঙ্খল স্তূপ যেন কেহ অবহেলাভরে চারিদিকে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়াছে। তাহার ফাঁকে ফাঁকে নিম্নভূমিতে গৈরিক বনানীর নিষ্প্রাণ হরিদাভা।

এই দুর্গম স্থানটিকে দুর্গপ্রকারের মত ঘিরিয়া রাখিয়াছে একটি গিরিচক্র। এই গিরিচক্রের গা বাহিয়া উপরে ওঠা মানুষের দুঃসাধ্য; কিন্তু একস্থানে এই নৈসর্গিক

প্রাকারের গায়ে একটি ফাটল আছে। ফাটলটি অতিশয় সঙ্কীর্ণ, কোনও অজ্ঞ আগন্তুক কিন্তু রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিয়া এমন কিছু দেখিতে পাইবে না যাহাতে তাহার সন্দেহ হইতে পারে যে এই প্রস্তরবিকীর্ণ জনহীন স্থান প্রতাপ সিং ও তাহার দস্যুদলের আস্তানা। কেবল প্রতাপ ও তাহার মুষ্টিমেয় পার্শ্বচরেরাই ইহার সন্ধান জানে। দেশ জুড়িয়া প্রতাপের শত শত অনুচর আছে, ডাক পাইলেই তাহারা প্রতাপের সঙ্গে যোগ দিবে; কিন্তু তাহারা প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহী, প্রতাপের গুপ্ত আস্তানার ঠিকানা জানে না। যাহারা নামকাটা বিদ্রোহী-রাজদণ্ডের ভয়ে যাহাদের লোকসমাজ ছাড়িয়া পলাইতে হইয়াছে তাহারাই প্রতাপের নিত্যসঙ্গী, গোপন ঘাঁটির সন্ধানও কেবল তাহারাই জানে।

সূর্য পাহাড়ের চূড়ার আড়ালে ঢাকা পড়িয়াছে কিন্তু অস্ত যায় নাই। দিবাবসানের প্রাক্কালে এই নিভৃত স্থানে একটি কৌতুককর অভিনয় চলিতেছিল।

তিলু ঝরনায় জল ভরিতে আসিয়াছিল। স্থানটি চারিদিক হইতে বেশ আড়াল করা; যেখানে ঝরনার জল ঝরিয়া পড়িতেছে তাহার চারিপাশে শ্যামল শষ্পের সজীবতা। তিলু কলসে জল ভরিয়া ফিরিবার পথে দেখিল, ভীমভাই একটি প্রস্তরখণ্ডে পিঠ দিয়া দীর্ঘ পদযুগল দ্বারা তিলুর পথ আগুলিয়া বসিয়া আছে। তাহার হাতে একটি বাঁশের এড়ো বাঁশী। ভীমভাইয়ের চাতুরী বুঝিতে তিলুর বাকি রহিল না; সে মুখ টিপিয়া হাসিল, বলিল,-

বাঃ, পা ছড়িয়ে বসে আছ? আমাকে জল নিয়ে যেতে হবে না? রাত্তিরের রান্না এখনও বাকি।

ভীমভাই কপট কোপে চক্ষু পাকাইয়া বলিল,–

পাশে বসো।

তিলুও মনে মনে তাই চায়; এই নবদম্পতি নিভৃতে পরস্পর সঙ্গলাভের বড় একটা সুযোগ পায় না। কিন্তু আজ বিশেষ কোনও কাজ নাই, প্রতাপও বাহিরে গিয়াছে, এই অবকাশে ভীমভাই দলের আর সকলকে এড়াইয়া ঝরনাতলার নির্জনে তিলুকে একলা পাইয়াছে। তিলু ভরা-ঘট নামাইয়া ভীমভাইয়ের পাশে পাথরে ঠেস দিয়া বসিল, পরিতৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,-

আমার দায়-দোষ নেই। প্রতাপভাই যদি জিজ্ঞেস করেন

ভীমভাই তিলুর মাথাটা ধরিয়া নিজের কাঁধের উপর রাখিয়া দিল; তারপর বাঁশী অধরে তুলিয়া তাহাতে ফুঁ দিল। তিলু মুকুলিত-নেত্রে স্বামীর কাঁধে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া রহিল।

নৃত্য-চপল গ্রাম্য সুর, কিন্তু ভীমভাইয়ের ফু বড় মিঠা। শুনিতে শুনিতে তিলুর পা দুটি বাঁশীর তালে তালে নড়িতে লাগিল। ক্রমে তাহার কণ্ঠ হইতে নিদ্রালু পাখির মৃদু কুজনের মত গানের কথাগুলি বাহির হইয়া আসিল

পায়েলা মোর চপল হল
তব বাঁশীর সুরে—

ঝরনা হইতে বেশ খানিকটা দূরে একটি গুহার মুখ। গুহার ভিতরে অন্ধকার, সম্মুখে একটি বৃহৎ গাছের গুঁড়ি অঙ্গারস্তূপে পরিণত হইয়া স্তিমিতভাবে জ্বলিতেছে। এই অগ্নি ঘিরিয়া তিনটি পুরুষ প্রস্তরখণ্ডের আসনে বসিয়া আছে।

প্রথম, নানাভাই–বেঁটে গজস্কন্ধ মহাবলবান; সে একটা বশার প্রান্তে ভুট্টা গাঁথিয়া তাহাই পোড়াইয়া খাইতেছে। দ্বিতীয়, প্রভু-মধ্যবয়স্ক কিন্তু বলিষ্ঠ পুরুষ; সে করলগ্নকপোলে বসিয়া গম্ভীরচক্ষে আগুনের পানে চাহিয়া আছে। তৃতীয়, পুরন্দর- শ্যামকান্তি যুবা, কর্মঠ, বালকস্বভাব; সে চামড়ার কয়েকটা লম্বা ফালি লইয়া ক্ষিপ্র নিপুণহস্তে ঘোড়ার লাগাম বুনিতেছে। ইহারাই প্রতাপের দল।

প্রভু দিবাস্বপ্ন ভাঙিয়া একবার সহচরদিগের উপর চক্ষু বুলাইল।–

ভীমকে দেখছি না।

বাকি দুইজন চারিদিকে চাহিল; তারপর পুরন্দর গিয়া গুহার মধ্যে উঁকি মারিয়া আসিল।

তিলুবেনও নেই, বোধ হয় জল আনতে গেছে।

হুঁ। কিন্তু ভীম কোথায়?

এই সময়, যেন প্রভুর প্রশ্নের উত্তরে দুর হইতে বাঁশীর নিঃস্বন ভাসিয়া আসিল। কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না ভীমভাই কোথায়। নানা ভুট্টায় কামড় মারিতে গিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। প্রভুর গম্ভীর মুখেও একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল। পুরন্দর লাগাম বুনিতে বুনিতে স্মিতমুখে মাথাটি নাড়িতে লাগিল।

পুরন্দর বলিল,-চোরের মন বোঁচকার দিকে। কিন্তু যাই বল, ভীমভাই খাসা বাঁশী বাজায়; দূর থেকে শুনে সুখ হয় না বলিয়া মিটিমিটি বাকি দুইজনের পানে তাকাইতে লাগিল।

ওদিকে ভীমভাই পূর্ববৎ বাঁশী বাজাইতেছে; তিলুর পায়েলিয়া তাহার সহিত সঙ্গত করিয়া চলিয়াছে। তিলু গাহিতেছে–

পায়েলা মোর চপল হল
তব বাঁশীর সুরে!
শ্যামলিয়া ওগো শ্যামলিয়া
তুমি কত দূরে—
বুকের কাছে— তবু কত দূরে।

ভীমভাই আড়চোখে তিলুর পায়ের দিকে দেখিয়া বাঁশী বাজাইতে বাজাইতেই তাহাকে একটা কনুইয়ের ঠেলা দিল। কনুইয়ের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট, তিলু উঠিয়া ঘাগরি ওড়নি

সংবরণপূর্বক গানের তালে তালে নাচিতে আরম্ভ করিল। কাথিয়াবাড় গুজরাতের সব মেয়েরাই নাচিতে জানে, ছেলেবেলা হইতে তাহারা গরবা নাচিতে অভ্যস্ত। এ বিষয়ে তাহাদের কোনও সঙ্কোচ নাই।

তিলু নৃত্যের তালে তালে গাহিল

যে পথে যাই খুঁজে না পাই ঘন কুঞ্জবনে,
      সোহাগ ভরে বাঁশী ডাকে অলি গুঞ্জরণে—
      ওগো প্রিয়া, তুমি কত দূরে
      বুকের মাঝে তবু কত দূরে।

পাহাড়ের যে রন্ধ্রটি দিয়া এই উপত্যকার একমাত্র প্রবেশপথ, সেই পথে প্রতাপ মোতির পৃষ্ঠে প্রবেশ করিল। প্রতাপের কোলের কাছে খাদ্যবস্তুর ঝুলিটা বিরাজ করিতেছে। প্রতাপ মোতিকে দাঁড় করাইয়া একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিল, ক্ষীণ বাঁশীর আওয়াজ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল।

সে ঈষৎ বিস্ময়ে ভ্রূ তুলিল, তারপর আওয়াজ লক্ষ্য করিয়া মোতিকে চালিত করিল।

ঝরনার ধারে ভীমভাইয়ের বাঁশী সমে আসিয়া থামিল। তিলুর নাচও একটি ঘূর্ণিপাকে সমাপ্তি লাভ করিল। সে ভীমের কাছে ফিরিয়া আসিয়া আবার তাহার কাঁধে মাথা রাখিয়া বসিল। দুজনের মনেই তৃপ্তির পরিপূর্ণতা।

তিলু বলিল,-কেমন মজা হল। কেউ জানতে পারল না যে তোমার সঙ্গে আমার চুপি চুপি দেখা হয়েছে।

শূন্য হইতে একটি আওয়াজ অসিল

নাঃ, কেউ জানতে পারল না।

চমকিয়া তিলু ও ভীমভাই দেখিল অনতিদূরে একখণ্ড পাথরের উপর কনুই রাখিয়া প্রভু করলগ্নকপোল দাঁড়াইয়া আছে। তাহার কিছু দূরে বলগা-বয়নরত পুরন্দর দাঁড়াইয়া তখনও গানের তালে তালে মাথাটি নাড়িয়া চলিয়াছে। আর সর্বশেষে নানাভাই, বেদীর মত উচ্চ প্রস্তরের উপর পদ্মাসনে বসিয়া শাঁকালু ভক্ষণরত ভাল্লুকের মত দন্ত বিকশিত করিয়া আছে এবং ভুট্টা খাইতেছে।

ধরা পড়ার লজ্জায় তিলু দুহাতে মুখ ঢাকিল।

এই সময় প্রতাপ আসিয়া উপস্থিত হইতেই সকলে আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল।

ভীমভাই বলিল,-সর্দার, বলতে নেই ঝুলিতে কি একটা মহাজন পুরে নিয়ে এলে?

প্রতাপ হাসিয়া বলিল,—না, চিন্তা তোমাদের জন্যে খাবার পাঠিয়েছে।

মুহূর্তমধ্যে ঝুলি লইয়া সকলে বসিয়া গেল। প্রতাপ মোতিকে ঘাসের উপর ছাড়িয়া দিয়া অদূরে একটা পাথরের উপর বসিয়া তাহাদের আহার দেখিতে লাগিল; তিলু তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া পিছনে দাঁড়াইল। প্রভু খাইতে খাইতে একখণ্ড ধোকড়া প্রতাপকে দান করিলে প্রতাপ তাহা নিজে না খাইয়া কাঁধের উপর দিয়া তিলুকে বাড়াইয়া দিল।

তিলু বলিল,-তুমি নিজে খাও না প্রতাপভাই।

প্রতাপ বলিল,-চিন্তা আমাকে অনেক খাইয়েছে। তুমি খাও।

তিলু ধোকড়াতে একটু কামড় দিয়া বলিল,–

চিন্তা বেনকে সেই একবারই দেখেছি। তাকে এখানে নিয়ে আস না কেন প্রতাপভাই? আমরা দুজনে কেমন একসঙ্গে থাকব

প্রতাপ চক্ষু তুলিয়া আকাশের পানে চাহিল। বলিল,-আমারই কি ইচ্ছা করে না। কিন্তু

হঠাৎ থামিয়া গিয়া প্রতাপ শ্যেনদৃষ্টিতে ঊর্ধ্বে চাহিয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। তিলুও তাহার দেখাদেখি আকাশের পানে চাহিল; ক্রমে সকলের দৃষ্টিও ঊর্ধ্বগামী হইল।

আকাশে একটি সঞ্চরমান কৃষ্ণবিন্দু দেখা দিয়াছে। দেখিতে দেখিতে বিন্দুটি একটি পাখিতে পারিণত হইল। প্রতাপ সঙ্কুচিত চক্ষে দেখিতে দেখিতে অস্ফুটস্বরে বলিল,-

চিন্তার পায়রা! এরি মধ্যে কি খবর পাঠাল চিন্তা?

পারাবত একবার তাহাদের মাথার উপর প্রদক্ষিণ করিয়া প্রতাপের কাঁধের উপর আসিয়া বসিল। তাহার পায়ে একটি কাগজ জড়ানো রহিয়াছে। প্রতাপ পা হইতে চিঠি খুলিয়া লইয়া পায়রাটিকে তিলুর হাতে দিল, তারপর চিঠি খুলিয়া লইয়া পড়িতে লাগিল।

আর সকলে প্রতাপকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রভু প্রশ্ন করিল,–

কী খবর?

পড়িতে পড়িতে প্রতাপের মুখ গম্ভীর হইয়াছিল, সে চিঠি পড়িয়া শুনাইল, তুমি চলে যাবার পরই একটা খবর পেলাম তোমাকে ধরবার জন্য একদল সৈন্য রওনা হয়েছে। তাদের সর্দার তেজ সিং।

প্রভুর ললাট মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল; সে মুখের উপর দিয়া একটা হাত চালাইয়া ভাবহীন কণ্ঠে বলিল,-

তেজ সিংকে আমি জানি একটা মানুষের মত মানুষ।

প্রতাপ চিঠিখানি মুড়িতে মুড়িতে ভ্রূবদ্ধ ললাটে আবার আকাশের পানে চাহিল। পশ্চিমদিগন্তে গিরি-মালার অন্তরালে তখন দিবাদীপ্তি প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে।

4

রাজধানীর প্রশস্ত রাজপথ দিয়া একদল পদাতিক সৈন্য চলিয়াছে। চারিজন করিয়া সারি, সৈনিকদের কাঁধে বন্দুক, কোমরে কিরিচ। তাহাদের আগে আগে অশ্বপৃষ্ঠে সর্দার তেজ সিং চলিয়াছেন। বলিষ্ঠ উন্নত দেহ, বুদ্ধিদীপ্ত গম্ভীর মুখ, মাথায় পাগড়ির আকারে বাঁধা টুপি, সর্দার তেজ সিংকে দেখিলে মনে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের উদয় হয়। ইনি রাজ্যের একজন উচ্চপদস্থ সেনানায়ক এবং সম্ভবত রাজসরকারে একমাত্র কর্তব্যনিষ্ঠ ন্যায়পরায়ণ লোক। তাঁহার বয়স ত্রিশের কিছু অধিক।

রাস্তার দুই পাশে লোক জমিয়াছিল, কিন্তু সকলেই নীরব, সকলের মুখেই অপ্রসন্নতার অন্ধকার। প্রতাপকে সৈন্যদল ধরিতে যাইতেছে ইহাতে রাজ্যের আপামর সাধারণ কেহই সুখী নয়। কিন্তু রাজা ও রাজপরিষৎ মহাজনদের মুঠার মধ্যে, তাই রাজ্যের দণ্ডনীতিও প্রকৃত অপরাধীর বিরুদ্ধে প্রযুক্ত না হইয়া সমাজের কল্যাণকামীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হইয়াছে।

পথপার্শ্বের জনতার মধ্যে প্রভু দাঁড়াইয়া ছিল; তাহার মাথার উপর প্রকাণ্ড একটা পাগড়ি তাহার মুখখানাকে একটু আড়াল করিয়া রাখিয়াছিল। সৈন্যগণ মশমশ শব্দে চলিয়া গেল; জনতাও ছত্রভঙ্গ হইয়া আপন আপন পথে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। কেবল প্রভু বক্ষ বাহুবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

একটি ন্যুব্জদেহ বৃদ্ধ ভিক্ষুক প্রভুর পাশে আসিয়া হাত পাতিল

ভিক্ষে দাও বাবা

প্রভু ভিক্ষুকের দিকে ফিরিতেই ভিক্ষুক চোখ টিপিল।

প্রভু নিম্নকণ্ঠে বলিল,-লছমন?

লছমন বলিল,-হ্যাঁ বাবা, যা আছে তাই ভিক্ষে দাও বাবা— গরীবের পেটে অন্ন নেই, ঘরে ঘরে কাঙালী

প্রভু কোমর হইতে কয়েকটি মোহর বাহির করিয়া লছমনের হাতে দিল, লছমন মোহরগুলি মুঠিতে লইয়া বস্ত্রের মধ্যে লুকাইল।

বেঁচে থেকো বাবা রাজা হও

ছদ্মবেশী লছমন আশীর্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

.

রাত্রিকাল। শহরের উপকণ্ঠে একটি কুটিরের অভ্যন্তর। ঘরের কোণে ম্লান তৈল-দীপ জ্বলিতেছে। একটি অকালবৃদ্ধা অনাহারজীর্ণা রমণী মেঝেয় বসিয়া ছিন্ন কাঁথা সেলাই করিতেছে।

একজন মধ্যবয়স্ক পুরুষ ঘরে প্রবেশ করিতেই রমণী তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। পুরুষের চক্ষু কোটর-প্রবিষ্ট, জঠর মেরুদণ্ড-সংলগ্ন, সে টলিতে টলিতে আসিয়া ঘরের কোণে চারপাইয়ের উপর বসিয়া দুহাতে মুখ ঢাকিল। রমণী তাহার কাছে গিয়া উদ্বেগ-স্খলিত কণ্ঠে বলিল,-

এ কি! তুমি একলা ফিরে এলে যে! রমণিক কোথায়?

পুরুষ হাত হইতে মুখ তুলিয়া কিছুক্ষণ উদভ্রান্তভাবে চাহিয়া রহিল—

রমণিক! না, সে ফিরে আসেনি

রমণী ব্যাকুলভাবে পুরুষের কাঁধ নাড়া দিতে দিতে বলিল,-

ওগো, ঐটুকু ছেলেকে কোথায় ফেলে এলে? শহরে গিয়েছিলে শাক-ভাজী বিক্রি করতে, ছেলেকে কোথায় রেখে এলে?

পুরুষ রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল,-তাকে—তাকে মহাজনের লোকেরা টেনে নিয়ে গেল

অ্যাঁ—

রমণী সেইখানেই বসিয়া পড়িল, পুরুষ উদভ্রান্তবৎ আপন মনে বলিতে লাগিল,

শাক-ভাজীর ঝুড়ি নিয়ে বাজারে বেচতে বসেছিলাম এমন সময় মহাজনের পেয়াদা এল–ঝুড়ি নিয়ে গেল। সেই সঙ্গে রমণিককেও হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল। বলে গেল, যতদিন না শেঠের সুদ চুকিয়ে দিতে পারবি ততদিন তোর ছেলে আটক থাকবে—শুধু জল খাইয়ে রাখব, তাড়াতাড়ি টাকা শোধ করতে না পারিস তোর ছেলে না খেয়ে মরবে।

রমণী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া উপুড় হইয়া পড়িল, পুরুষ তেমনি বিহ্বলভাবে বলিয়া চলিল,

কি করব? কোথায় টাকা পাব? কত লোকর কাছে টাকা চাইলাম, কেউ দিলে না। অ্যাঁ–ওকি! ওকি!

রমণী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পুরুষের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিল, ঘরের ক্ষুদ্র জানালা দিয়া একটা হাত প্রবেশ করিয়া জানালার উপর কিছু রাখিয়া দিয়া আবার অন্তর্হিত হইয়া গেল। রমণী ব্যাকুলত্রাসে পুরুষের পানে চাহিল।

রমণী ত্রাসবিকৃত স্বরে বলিল,-ওগো, ও কে? কার হাত?

পুরুষ মাথা নাড়িল, তারপর উঠিয়া সঙ্কোচ-জড়িত পদে জানালার দিকে গেল। জানালার উপর দুইটি মোহর রাখা রহিয়াছে, দীপের আলোকে যেন চিকমিক করিয়া হাসিতেছে।

রমণী পুরুষের পিছু পিছু আসিয়াছিল, দুজনে কিছুক্ষণ বুদ্ধিভ্রষ্টের মত মোহরের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর রমণী হাত বাড়াইয়া মোহর দুটি তুলিয়া লইল

ওগো, এ যে সোনার টাকা–মোহর! কে দিলে? কোথা থেকে এল?

পুরুষ যখন কথা কহিল তখন তাহার কণ্ঠস্বর থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল—

বুঝেছি—এ প্রতাপ! আমাদের বন্ধু—গরীবের বন্ধু প্রতাপ।

.

রাত্রিকাল; আর একটি জীর্ণ কক্ষ। একটি পাকা ঘর; কিন্তু দেয়ালের চুনবালি খসিয়া গিয়াছে। একটি ভাঙা তক্তপোশের উপর পাঁচ বছরের একটি শিশু শুইয়া আছে, মাথার শিয়রে কালিপড়া লণ্ঠনের আলোতে তাহার অস্থির দেহ দেখা যাইতেছে। তাহার মা—একটি শীর্ণকায়া যুবতী-পাশে বসিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছে। রুগ্ন শিশু বায়না ধরিয়াছে

মা, দুধ খাব খিদে পেয়েছে

মা বলিতেছে,—ছি বাবা, তোমার অসুখ করেছে— এখন ওষুধ খেতে হয়—

শিশু বলিল,-না, ওষুধ খাব না—দুধ খাব

এই দ্যাখো না, তোমার বাপু এখনি তোমার জন্যে কত মুসম্বি আর ওষুধ নিয়ে আসবে—ঘুমিয়ে পড় বাবা

মা শিশুর মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল, শিশু ঝিমাইয়া পড়িল। শিশুর কঙ্কালসার দেহের দিকে চাহিয়া যুবতীর চোখ দিয়া টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল, সে অধোচ্চারিত ভগ্নস্বরে বলিল,-

ভগবান, অন্ন দাও—আমার ছেলে না খেয়ে মরে যাচ্ছে, তাকে অন্ন দাও

ঠুং করিয়া শব্দ হইল। গলদশ্রুনেত্রা যুবতী চুপ করিয়া শুনিল—কিসের শব্দ! আবার ঠুং করিয়া শব্দ হইল। যুবতী তখন পাশের দিকে চক্ষু নামাইয়া দেখিল, মেঝের ওপর চকচকে গোলাকার দুটি ধাতুখণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে। অবশভাবে যুবতী সে দুটি হাতে তুলিয়া লইল, একাগ্রদৃষ্টিতে ক্ষণেক তাহাদের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সহসা মোহর দুটি বুকে চাপিয়া ধরিল, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,-

এ তো আর কেউ নয়— প্রতাপ। প্রতাপ। গরীবের তুমিই ভগবান!

.

পূর্বে বলা হইয়াছে, চিন্তার জলসত্রের পিছনে কিছুদূরে একটি ঝরনা আছে; পাহাড় গলিয়া এই প্রস্রবণের জল একটি ক্ষুদ্র অথচ গভীর জলাশয়ে সঞ্চিত হইয়াছিল। চারিদিকের ঝোপঝাড়ের মধ্যে স্বচ্ছ সবুজ সরোবরের দৃশ্যটি বড় নয়নাভিরাম।

প্রাতঃকালে চিন্তা কলস লইয়া জল ভরিতে যাইতেছিল। নির্জন উপল-বিপর্সিত পথ দিয়া যাইতে যাইতে সে আপন মনে গাহিতেছিল—

মনে কে লুকিয়ে আছে—মন জানে
    মরমের কোন্ গহনে কোন্‌খানে
    মন জানে।
    মনের মানুষ মনের মাঝে রয়
    মনে তাই মলয় বায়ু বয়
    চাঁদ ওঠে ফুল ফোটে বন্ধুর সন্ধানে
    সেকথা কেউ জানে না–মন জানে।

সরোবরের কিনারায় কয়েকটি শিলাপট্ট ঘাটের পৈঠার মত জলে নামিয়া গিয়াছে। চিন্তা কলস রাখিয়া একটি শিলাপট্টে নতজানু হইয়া নিজের চোখে মুখে জল দিল, তারপর কলস ভরিয়া কাঁখে তুলিবার উপক্রম করিল।

সহসা অদূরে মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। চিন্তা কলস না তুলিয়া সচকিতে পিছু ফিরিয়া চাহিল। ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়া দুইজন মানুষ কথা কহিতে কহিতে আসিতেছে; তাহাদের কাঁধে বাঁক, বাঁকের দুই প্রান্ত হইতে বড় বড় তামার ঘড়া ঝুলিতেছে।

মানুষ দুটি স্থূলকায়; মুখে বুদ্ধির নামগন্ধ নাই। তাহারা হাস্য-পরিহাস করিতে করিতে হঠাৎ চিন্তাকে জলের ধারে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, তারপর শঙ্কাবর্তুল চোখ মেলিয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

চিন্তা ইতিপূর্বে এই নির্জন অঞ্চলে কখনও মানুষ দেখে নাই, তাই অবাক হইয়া গিয়াছিল; কিছুক্ষণ নীরবে কাটিবার পর সে প্রশ্ন করিল,-

কে তোমরা?

মানুষ দুজন দৃষ্টি বিনিময় করিল, নিজ নিজ ঠোঁটের উপর আঙুল রাখিয়া পরস্পর সতর্ক করিয়া দিল, তাহারা সন্তর্পণে চিন্তার দিকে অগ্রসর হইল। কিছুদুর আসিয়া তারপর আবার দাঁড়াইল, আবার দৃষ্টি বিনিময় করিয়া ঠোঁটে আঙুল রাখিল, তারপর একজন জিজ্ঞাসা করিল,–

তুমি কে?

চিন্তা বলিল—কাছেই পরপ আছে, আমি পানিহারি্ন।

দুইজন তখন স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বাঁক নামাইল।

প্রথম মানুষ বলিল,-ও-পানিহারিন! আমরা ভেবেছিলাম

দ্বিতীয় মানুষ বলিল,—আমরা ভেবেছিলাম, তুমি পাহাড়ের উপদেবতা

চিন্তা একটু হাসিল, লোক দুটিকে বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না।

সে বলিল,—কিন্তু তোমরা কোথা থেকে এলে? এখানে কাছেপিঠে কেউ তো থাকে না।

প্রথম মানুষ বলিল,-আমরা ভিস্তি— আমরা—

সে আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু দ্বিতীয় ভিস্তি তাড়াতাড়ি তাহাকে বাধা দিল,—স্ স্ স।

সঙ্গে সঙ্গে প্রথম ভিস্তি ঠোঁটে আঙুল রাখিয়া শীৎকার করিয়া উঠিল,—স্ স্ স;

প্রথম ভিস্তি তাহার প্রতিধ্বনি করিল,—স্ স্ স্—আমরা এখানে নতুন এসেছি

চিন্তার মন সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল।

ও-তা কাজে এসেছ বুঝি?

প্রথম ভিস্তি বলিল,-কাজ? হুঁ—আমরা এসেছি

দ্বিতীয় ভিস্তি বলিল,-স্ স্ স্—কি কাজে এসেছি তা বলা বারণ। আমরা ফৌজীভিস্তি কিনা—একদল সিপাহীর সঙ্গে এসেছি।

প্রথম ভিস্তি বলিল,-স্ স স—

দ্বিতীয় ভিস্তি বলিল,-স্ স্ স্

চিন্তা আরও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল—

সিপাহী? কোথায় সিপাহী?

প্রথম ভিস্তি বলিল,-স্ স্ স্—এখান থেকে আধক্রোশ দূরে পাহাড়ের মধ্যে তাঁবু ফেলেছে সর্দার তেজ সিং

দ্বিতীয় ভিস্তি বলিল,—স স স—বেন, তুমি জানতে চেয়ো না, এসব ভারি গোপনীয় কথা—

চিন্তা বলিল,—আমি জানতে চাই না, জেনেই বা আমার লাভ কি? আমি শুধু ভাবছি এই পাহাড়ের মধ্যে এত সিপাহীর কি কাজ?

প্রথম ভিস্তি গম্ভীর মুখে বলিল,—কাজ আছে বেন, ভারি জবর কাজ। সর্দার তেজ সিং পঞ্চাশজন সিপাহী নিয়ে এসেছে

দ্বিতীয় ভিস্তি বলিল,-স্ স্ স্—এসব গোপনীয় কথা

চিন্তা বলিল,-না, তাহলে বোলো না—আমি যাই। আমার কলসী তুলে দেবে?

প্রথম ভিস্তি তাড়াতাড়ি বলিল,—দেব বৈ কি বেন— এই যে

কলসী চিন্তার কাঁখে তুলিয়া দিতে দিতে প্রথম ভিস্তি খাটো গলায় বলিল,–

ভারি গোপনীয় কথা বেন, কেউ জানে না— আমরা প্রতাপ বারবটিয়াকে ধরতে বেরিয়েছি — স্ স স–

আর অধিক সংবাদের প্রয়োজন ছিল না। চিন্তা পাংশু অধরে হাসি টানিয়া ঠোঁটে আঙুল রাখিল, বলিল,-

স স্ স্

উভয় ভিস্তি একসঙ্গে বলিল,—স স স—

চিন্তা আর দাঁড়াইল না, কলস কাঁখে ফিরিয়া চলিল।

.

গিরিচক্রের মাঝখানে একটি ছোট্ট প্রচ্ছন্ন উপত্যকা। তেজ সিং এইখানে শিবির ফেলিয়াছেন। সিপাহীরা ময়দানের মত সমতল স্থান ঘিরিয়া তাঁবু তুলিয়াছে; সর্দার তেজ সিং ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকলের কাজ তদারক করিতেছেন। চারিদিকে কর্মব্যস্ততা, কিন্তু চেঁচামেচি নাই।

সিপাহীদের বন্দুকগুলি একস্থানে মন্দিরের আকারে জড়ো করা রহিয়াছে; যেন উহাকে কেন্দ্র করিয়াই এই বস্ত্রনগরী গড়িয়া উঠিয়াছে।

চিন্তার পরপের পাশে বংশদণ্ডের মাথায় ছত্রের উপর বসিয়া কপোত দুটি রোদ পোহাইতেছে—পুরুষ কপোতটি থাকিয়া থাকিয়া গলা ফুলাইয়া গুমরিয়া উঠিতেছে।

চিন্তা পরপের প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইয়া আসিল, তাহার হাতে একটুকরা কাগজ। সে বারান্দার নীচে নামিয়া উর্ধ্বমুখে ডাকিল,

আয়-চুনি—আয়–

পুরুষ কপোতটি তৎক্ষণাৎ উড়িয়া আসিয়া তাহার কাঁধে বসিল। চিন্তা তাহাকে ধরিয়া তাহার পায়ে কাগজটি জড়াইয়া বাঁধিতে বাঁধিতে হ্রস্বকণ্ঠে বলিতে লাগিল,

চুনি—দেরি করো না—শিগগির যেয়ো–তোমার ওপর জীবন-মরণ নির্ভর করছে

চিন্তা দূত-কপোতকে ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করিল। কপোত শুন্যে একটা পাক খাইয়া পক্ষবাণ তীরের মত বিশেষ একটা দিক লক্ষ্য করিয়া উড়িয়া চলিল। যতক্ষণ দেখা গেল, উৎকণ্ঠিত চিন্তা সেই দিকে তাকাইয়া রহিল।

.

অপরাহ্নে প্রতাপের গুহা-ভবনের সম্মুখে ভস্মাচ্ছাদিত আগুন জ্বলিতেছিল। অগ্নিহোত্রীর যজ্ঞকুণ্ডের মত এ আগুন কখনও নেভে না, অতি যত্নে ইহাকে জ্বালাইয়া রাখিতে হয়। কারণ, এই লোকালয়বর্জিত স্থানে একবার আগুন নিভিলে আবার আগুন সংগ্রহ করা বড় কঠিন কাজ।

অগ্নিকুণ্ড ঘিরিয়া প্রতাপ প্রমুখ পাঁচজন বসিয়া ছিল। সকলেই চিন্তায় মগ্ন। প্রতাপ ললাট কুঞ্চিত করিয়া তরবারির অগ্রভাগ দিয়া মাটিতে খোঁচা দিতেছিল; প্রভু গালে হাত দিয়া আগুনের দিকে চাহিয়া ছিল; নানাভাই থাকিয়া থাকিয়া শুষ্ক গাছের ডাল অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতেছিল; পুরন্দর কিছুই করিতেছিল না, কেবল নিজের আঙুলগুলিকে পরস্পর জড়াইয়া বিচিত্র জটিলতার সৃষ্টি করিতেছিল। সর্বশেষে ভীমভাই একটু স্বতন্ত্র বসিয়া একটা খড়ের অগ্রভাগ নিজের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করিতেছিল। এই সকল বিবিধ কার্যকলাপ সত্ত্বেও তাহারা যে নিজ নিজ চিন্তায় নিবিষ্ট হইয়া আছে তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না।

অকস্মাৎ প্রচণ্ড হাঁচির শব্দে সকলের চিন্তাজাল ছিন্ন হইয়া গেল। সকলের ভর্ৎসনাপূর্ণ দৃষ্টি ভীমের দিকে ফিরিল, ভীম কিন্তু নির্বিকার চিত্তে আবার নাকে কাঠি দিবার উপক্রম করিল।

প্রভু বলিল,—ভীম, তোমার আর অন্য কাজ নেই?

ভীমভাই একটা হাত তুলিয়া সকলকে আশ্বাস দিল

থামো। মাথায় একটা মতলব আস্ব আস্ব করছে। যদি সাতবার হাঁচতে পারি তাহলেই মাথাটা সাফ হয়ে যাবে।

নানাভাই বলিল,-খবরদার। আমার মাথায় একটা বুদ্ধি উঁকি ঝুঁকি মারছিল, তোমার হাঁচির ধমকে ভড়কে পালিয়ে গেল।

ভীমভাই বলিল,-কিন্তু বলতে নেই মাথাটা কিঞ্চিৎ সাফ হওয়া যে দরকার।

প্রতাপ হাসিয়া বলিল,-দরকার বুঝলে তলোয়ার দিয়ে তোমার মাথা সাফ করে দিতে পারব—তোমাকে আর হাঁচতে হবে না।

ভীমভাই বিমর্ষভাবে বলিল,—বেশ, তবে বলতে নেই হাঁচব না।

খড় ফেলিয়া দিয়া ভীম নির্লিপ্তভাবে বসিল। প্রভু প্রতাপের দিকে ফিরিল—

কিছু মাথায় আসছে না। কী করা যায়?

প্রতাপ কহিল,—আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে। কিন্তু মুশকিল এই যে, তেজ সিং কোথায় আছে জানতে না পারলে কিছুই করা যায় না।

প্রভু বলিল,-সেই তো। আশ্চর্য ধড়িবাজ লোক। সেদিন স্বচক্ষে দেখলাম শহরের ভিতর দিয়ে কুচকাওয়াজ করে গেল। তারপর রাতারাতি সারা পল্টন কোথায় লোপাট হয়ে গেল, আর পাত্তাই নেই।

পুরন্দর বলিল,—কোথায় আস্তানা গেড়েছে জানতে পারলে—

নানাভাই বলিল,—জানতে পারলে রাতারাতি কচুকাটা করে দেওয়া যেত—লোকজন জড়ো করে দুপুর রাত্রে রে রে রে করে হানা দিতাম, ব্যস! ঘুম ভাঙবার আগেই কেল্লা ফতে।

প্রতাপ একটু হাসিয়া মাথা নাড়িল—

নানাভাই, ব্যাপার অত সহজ নয়। রাজার সিপাহীরা তো আমাদের শত্রু নয়, তারা রাজার নিমক খায় কর্তব্যের অনুরোধে আমাদের ধরতে এসেছে। তারা আমাদের জাতভাই, আমাদের দেশের লোক তাদের প্রাণে মারা আমাদের উচিত নয়। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে কৌশলে তাদের পরাস্ত করা, যাতে তাদের ক্ষতি না হয় অথচ আমাদের কার্যসিদ্ধি হয়।

ভীমভাই বলিল,-কিন্তু বলতে নেই সেটা কি করে সম্ভব?

প্রতাপ বলিল,—সেই কথাই তো ভাবছি। যদি জানতে পারতাম তেজ সিং তার পল্টন নিয়ে কোথায় লুকিয়ে আছে।

এই সময় তিলু গুহার ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। বলিল,—ঢের ভাবনাচিন্তে হয়েছে, এবার সব খাবে চল। পেটে রুটি পড়লেই মাথায় বুদ্ধি গজাবে।

সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল।

নানাভাই বলিল,-খাঁটি কথা বলেছ তিলুবেন। —পেট খালি তাই মাথা খালি।

নানাভাই পরম আরামে দুই হাত তুলিয়া আলস্য ভাঙিতে গিয়া সেই অবস্থায় রহিয়া গেল, তাহার চক্ষু আকাশে নিবদ্ধ হইয়া রহিল।

আরে, চিন্তাবেনের পায়রা মনে হচ্ছে—

দেখিতে দেখিতে চুনি আসিয়া প্রতাপের স্কন্ধে অবতরণ করিল। ত্বরিতহস্তে চিঠি খুলিয়া প্রতাপ পড়িল, তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—

চিন্তা লিখেছে—পঞ্চাশজন সিপাহী নিয়ে তেজ সিং পরপ থেকে আধ ক্রোশ দূরে তাঁবু ফেলেছে।

সকলে অবরুদ্ধ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

প্রভু বলিল,-যাক, তেজ সিংয়ের হদিস পাওয়া গেছে। এবার তোমার মতলবটা শুনি প্রতাপভাই।

প্রতাপ দুই বাহু প্রসারিত করিয়া সকলকে কাছে আহ্বান করিল,—কাছে সরে এস, বলছি।

সকলে প্রতাপকে ঘিরিয়া ধরিল, প্রতাপ একদিকে ভীমভাইয়ের এবং অন্যদিকে তিলুর কাঁধে হাত রাখিয়া বলিতে আরম্ভ করিল,-

আমি যে মতলব করেছি, ভীমভাই আর তিলু হবে তার নায়ক নায়িকা

তাহার কণ্ঠস্বর গোপনতার প্রয়োজনে ক্রমে গাঢ় ও হ্রস্ব হইয়া আসিল। সকলে পুঞ্জীভূত হইয়া শুনিতে লাগিল।

5

প্রাতঃকাল। তেজ সিংয়ের ছাউনিতে প্রাত্যহিক কর্মসূচনা আরম্ভ হইয়াছে, সিপাহীরা কুচকাওয়াজ করিতেছে। তেজ সিং তাহাদের পরিচালনা করিতেছেন।

কুচকাওয়াজ শেষ হইলে সিপাহীরা তাহাদের বন্দুকগুলি একস্থানে মন্দিরের আকারের দাঁড় করাইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। তেজ সিং নিজ শিবিরে প্রবেশ করিলেন।

এই সময়ে শিবিরচক্রের বাহিরে বাঁশীর শব্দ শোনা গেল। সিপাহীদের মধ্যে কেহ কেহ ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, তারপর কৌতূহলপরবশ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ভিস্তিযুগল কাঁধে বাঁক লইয়া ঝরনা হইতে জল ভরিয়া ফিরিতেছে, তাদের পিছনে অপরূপ দুটি মূর্তি।

মূর্তি দুটি ভীমভাই ও তিলু, কিন্তু অভিনব সাজ-পোষাকের ভিতর হইতে তাহাদের চিনিয়া লওয়া দুষ্কর। ভীমের পোষাক কতকটা কাবুলী ধরনের, থুতনির কাছে একটু দাড়ি গজাইয়াছে, মাথায় জরীর তাজ। তিলুর রঙচঙা ঘাগরা ও ওড়নির কোমরবন্ধ দেখিয়া তাহাকে বেদেনী বলিয়া মনে হয়; তার পায়ে ঘুঙুর, হাতে ঘণ্টিদার করতাল, মাথায় একখণ্ড লাল কাপড় জড়ানো।

ভিস্তিদ্বয় এই অবাঞ্ছিত সঙ্গীদের লইয়া বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। ঝরনাতলায় এই দুটি জীব বসিয়াছিল, তাহাদের সহিত কথা কহিতে গিয়া ভিস্তিরা দেখিল, তাহাদের ভাষা একেবারেই অবোধ্য। ভিস্তিরা প্রথমে খুবই আমোদ অনুভব করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা

যখন জল লইয়া ফিরিয়া চলিল তখন দেখিল ইহারাও পিছু লইয়াছে। তারপর সারাটা পথ তাহারা এই নাছোড়বান্দা অনুচর দুটিকে তাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু কৃতকার্য হয় নাই, ভীমভাই বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে এবং তিলু নৃত্যভঙ্গিমায় ঘুঙুর ঝকৃত করিতে করিতে তাহাদের অনুসরণ করিয়াছে।

শিবির সন্নিধানে পৌঁছিয়া ভিস্তিদ্বয় বাঁক নামাইয়া অত্যন্ত বিরক্তভাবে ভীম ও তিলুর দিকে ফিরিল।

প্রথম ভিস্তি হাত নাড়িয়া বলিল,—এই যাঃ—পালাঃ—আর এগুবি কি ঠ্যাং ভেঙে দেব!

দ্বিতীয় ভিস্তি বলিল,-দেখছিস না এটা সিপাহীদের ছাউনি—এখানে এলে সিপাহীরা ঘাড় ধরে মটকে দেবে—

যেন বড়ই সমাদরসূচক কথা, তিলু উজ্জ্বল মধুর হাসিয়া ঘাড় নাড়িল, বলিল,-

সি সি পিন্টু কালা থিলি সী।

এই সময় দুইজন সিপাহী আসিয়া উপস্থিত হইল।

প্রথম সিপাহী বলিল,-কি হয়েছে? এরা কারা?

প্রথম ভিস্তি হতাশভাবে বলিল,-আর কও কেন। ঝরনাতলা থেকে আমাদের পিছু নিয়েছে—এত তাড়াবার চেষ্টা করছি কিছুতেই যাচ্ছে না।

দ্বিতীয় সিপাহী বলিল,—বেদে বেদেনী মনে হচ্ছে।

ভীমভাই সম্মুখে আসিয়া নিজের বুকে হাত রাখিল। বলিল,-

মি গুরগুট—থালা থালা মান্ডি। (তিলুকে দেখাইয়া) হাড্ডি মাসোমা চিল্লু-সী।

তিলু হাস্যোদ্ভাসিত মুখে ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল, তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে করতাল ঊর্ধ্বে তুলিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল। ভীমভাই অমনি বাঁশীতে সুর ধরিল।

সিপাহীরা ইহাদের অদ্ভুত আচরণ দেখিয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে আরও কয়েকজন সিপাহী আসিয়া জুটিল, সকলে মিলিয়া এই বিচিত্র জীব-দুটিকে ঘিরিয়া ধরিল। তিলু তখন উৎসাহ পাইয়া নাচের সহিত গান ধরিল,-

চিচিন্ থুলা পিচিন্ থুলা পিন্টি থুলা রি
    আন্ডি গালা ভাডি বালা হাল্লাহালা সী—
    গিজিং ঘিয়া গিজিং ঘিয়া—

ক্রমে গীতবাদ্যের শব্দে আকৃষ্ট হইয়া ছাউনিতে যে যেখানে ছিল আসিয়া জুটিল। চক্রায়িত দর্শক-মণ্ডলীর হাসি মস্করার মধ্যে তিলুর কটাক্ষ-বিভ্রম-বিলোল নৃত্যগীত চলিতে লাগিল।

সর্দার তেজ সিং নিজ শিবিরে গিয়া বসিয়াছিলেন, দুর হইতে এই অনভ্যস্ত আওয়াজ কানে যাইতে তিনি ভ্রূকুটি করিয়া উঠিয়া তাঁবুর বাহিরে আসিলেন।

শিবিরবৃত্তের অপর প্রান্তে সিপাহীদের দল জমা হইয়াছে দেখিয়া তাহার ভুকুটি আরও গভীর হইল। তিনি সেই দিকে চলিলেন।

সিপাহীদের মজলিশ তখন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। তিলু নাচিতে নাচিতে কখনও একটি সিপাহীর চিবুক ধরিয়া নাড়িয়া দিতেছে, কখনও অন্য একটির বুকে করতালের টোকা মারিয়া দিতেছে—সঙ্গে সঙ্গে হাসির ফোয়ারা ছুটিতেছে। তেজ সিং আসিতেই সিপাহীদের হল্লা কিঞ্চিৎ শান্ত হইল, তাহারা সসম্ভ্রমে তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিল। কিন্তু তিলুর চপলতা কিছুমাত্র হ্রাস পাইল না, তেজ সিংকে দেখিয়া তাহার রঙ্গ-ভঙ্গিমা যেন আরও বাড়িয়া গেল। সে প্রথমে তাঁহাকে ঘিরিয়া একপাক নাচিয়া লইল, তারপর সম্মুখে দাঁড়াইয়া তরলকণ্ঠে গাহিল,-

আওলা দুলা সি যাওলা থুলা রি
গিজিং ঘিয়া গিজিং ঘিয়া—

তেজ সিং প্রথমটা একটু সন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু ক্রমে তাঁহার মনের মেঘ কাটিয়া গেল। তিনি অনুমান করিলেন, ইহারা যাযাবর বেদে; ইহাদের অগম্য স্থান নাই–যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়ানো এবং নাচিয়া গাহিয়া পয়সা কুড়ানোই ইহাদের পেশা। তেজ সিং মনে মনে স্থির করিলেন, নাচ শেষ হইলে ইহাদের শিবিরে লইয়া গিয়া প্রশ্ন করিবেন, হয়তো ইহারা বারবটিয়াদের সন্ধান জানিতে পারে।

নাচ গান চলিতে লাগিল, তেজ সিং স্মিতমুখে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে এই মুগ্ধ-জনতার পশ্চাতে এক বিচিত্র ছায়াবাজির অভিনয় আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল, তাহা কেহই লক্ষ্য করে নাই। শিবিরগুলির ব্যবধান পথে চারিটি মানুষ নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া সঞ্চিত বন্দুকগুলি সরাইয়া ফেলিতেছিল, হাতে হাতে বন্দুকগুলি শিবিরচক্রের অপর পারে অদৃশ্য হইতেছিল। মানুষগুলি আর কেহ নয়, প্রতাপ নানাভাই প্রভু ও পুরন্দর।

শিবিরের পশ্চাদ্ভাগে মোতি ও আরও সাতটি ঘোড়া দাঁড়াইয়া ছিল, বন্দুকগুলি তাহাদেরই একটির পিঠে লাদাই হইতেছিল। অবশেষে সমস্ত বন্দুক ঘোড়ার পিঠে লাদাই হইল, কেবল চারিজন শিকারীর হাতে চারিটি বন্দুক রহিয়া গেল। প্রতাপ বাকি তিনজকে ইশারা করিল, তারপর সকলে নিঃশব্দে অগ্রসর হইল।

ওদিকে নাচগানও শেষ হইয়াছিল, ভীমভাই ও তিলু নত হইয়া তসলিম করিতেই তেজ সিং বলিলেন,-

তোমরা আমার সঙ্গে এস–বকশিশ পাবে।

তিলু এবার বিশুদ্ধ সহজবোধ্য ভাষায় কথা কহিল,

মাফ করবেন সর্দারজী, আপনিই আজ আমাদের সঙ্গে যাবেন।

সকলে চমকিয়া দেখিল, ভীমভাই ও তিলুর হাতে দুটি পিস্তল বাঁশী ও করতাল কখন প্রাণঘাতী-অস্ত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে।

ভীমভাই সিপাহীদের বলিল,-তোমরা কেউ গণ্ডগোল করো না। বলতে নেই গণ্ডগোল করলেই বিপদ ঘটবে।

ক্রোধে মুখ রক্তবর্ণ করিয়া তেজ সিং বলিলেন,–

একি! কে তোমরা?

তিলু বলিল,-পিছন ফিরে চেয়ে দেখুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন।

সকলে পিছন দিকে ফিরিয়া যাহা দেখিল তাহাতে চিত্রার্পিতের মত দাঁড়াইয়া রহিল। চারিটি বন্দুক তাহাদের দিকে লক্ষ্য করিয়া আছে। তেজ সিং ক্ষণকালের জন্য বিমূঢ়

হইয়া গেলেন। এই ফাঁকে ভীম ও তিলু সিপাহীদের দল হইতে বাহির হইয়া দস্যুদের কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

প্রতাপ বন্দুক হইতে চোখ তুলিয়া গম্ভীরস্বরে বলিল,

সিপাহীদের বলছি, তোমরা ছাউনি ছেড়ে চলে যাও নইলে বন্দুক ছুঁড়ব। প্রথমেই সর্দার তেজ সিং জখম হবেন।

সিপাহীরা পিছু হটিল। অস্ত্রহীন সিপাহীর মত অসহায় প্রাণী আর নাই। তেজ সিং কিন্তু বাঘের মত ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, তরবারি নিষ্কাশিত করিয়া গর্জন করিলেন,

খবরদার! কেউ পালিয়ো না। ওরা পাঁচজন, আমরা পঞ্চাশজন। এস, সবাই একসঙ্গে ওদের ওপর লাফিয়ে পড়ি

সিপাহীরা দ্বিধাভরে ফিরিল। প্রতাপ বলিল,–

সাবধান, কেউ এদিকে এগিয়েছ কি আগে সর্দারকে মারব! যদি সর্দারের প্রাণ বাঁচাতে চাও, সব ছাউনির বাইরে যাও।

সিপাহীরা তথাপি ইতস্তত করিতেছিল, ভীমভাই হঠাৎ পিস্তল তুলিয়া শুন্যে আওয়াজ করিল। আর কেহ দাঁড়াইল না, মুহূর্তমধ্যে ছাউনির বাহিরে অদৃশ্য হইয়া গেল। কেবল তেজ সিং ক্রুদ্ধ হতাশায় চক্ষু আরক্ত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

প্রতাপ বন্দুক নামাইয়া তেজ সিংয়ের সম্মুখীন হইল। বলিল,-

সর্দার তেজ সিং, আপনি আমাদের বন্দী, আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।

তেজ সিং প্রজ্বলিত চক্ষে প্রতাপের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। বলিলেন,

তুমি প্রতাপ সিং? (প্রতাপ মাথা ঝুঁকাইল) রাজপুত হয়ে তুমি এমন শঠতা করবে ভাবিনি—ভেবেছিলাম যুদ্ধ করবে।

প্রতাপ বলিল,-আপনি যোদ্ধা, আপনিই বলুন, পঞ্চাশজনের সঙ্গে পাঁচজনের যুদ্ধ কি সম্ভব? না-ন্যায়সঙ্গত? কিন্তু ও আলোচনা পরে হবে।–নানাভাই, সদারের চোখ বাঁধো। কিছু মনে করবেন না, তলোয়ারটি দিতে হবে। পুরন্দর, ঘোড়া নিয়ে এস।

সর্দার তলোয়ার ফেলিয়া দিলেন। পুরন্দর ঘোড়া আনিতে গেল। নানাভাই তিলুর মাথা হইতে লাল বস্ত্রখণ্ডটি তুলিয়া লইয়া সর্দারের চোখ বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইল। সর্দার বাধা দিলেন না, সগর্ব নিষ্ক্রিয়তায় বক্ষ বাহুবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ভীম ও তিলু পরস্পরের পানে চাহিয়া বিগলিতহাস্য বিনিময় করিল।

তিলু চুপিচুপি বলিল,-বাপপো নাগিনা—গিজিং ঘিয়া।

ভীম মুরব্বীয়ানা দেখাইয়া তাহার পিঠ চাপড়াইয়া দিল। বলিল,-

থালা থালা মান্ডি—গুরগুট।

.

দস্যুদের গুহা-ভবনের সম্মুখ। সারি সারি আটটি ঘোড়া আসিয়া দাঁড়াইল। সকলে অবতরণ করিল; তেজ সিংকে নামাইয়া তাঁহার চোখ খুলিয়া দেওয়া হইল।

প্রতাপ ঈষৎ হাসিয়া বলিল,-সদারজী, এই আমাদের আস্তানা। আমরা পরের ধন লুট করি বটে কিন্তু নিজেরা ভোগ করি না তা বোধ হয় বুঝতে পারছেন।

তেজ সিং উত্তর দিলেন না, গর্বিত ঘৃণায় চারিদিকে চক্ষু ফিরাইয়া কর্কশস্বরে বলিলেন,

এইখানে আমাকে বন্দী থাকতে হবে?

প্রতাপ বলিল,—হ্যাঁ। তবে যদি আপনি কথা দেন যে পালাবার চেষ্টা করবেন না তাহলে আপনাকে বন্দী করে রাখবার দরকার হবে না।

তেজ সিং বলিলেন,—তোমরা কাপুরুষ বেইমান, তোমাদের আমি কোনও কথা দেব না।

প্রতাপের মুখ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু সে ধীরস্বরেই উত্তর দিল,

সর্দার তেজ সিং, আমরা অপমানে অভ্যস্ত নই। কেন যুদ্ধ না করে কৌশল অবলম্বন করেছিলাম সে কথা আগে বলছি। নিরপরাধ সিপাহীদের হত্যা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, যে নির্গুণ রাজশক্তি দুষ্টের দমন না করে দুষ্টের পালনে আত্মনিয়োগ করেছে তার চেষ্টা ব্যর্থ করে দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য।

তেজ সিং বলিলেন,—কাপুরুষের মুখে নীতির কথা শোভা পায় না। যদি যুদ্ধে হারিয়ে আমাকে বন্দী করতে পারতে তাহলে বুঝতাম।

প্রতাপের মুখ কঠিন হইয়া উঠিল, সে কিছুক্ষণ প্রখর দৃষ্টিতে তেজ সিংয়ের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল,-

আপনি আমার সঙ্গে অসিযুদ্ধে রাজি আছেন?

তেজ সিং বলিলেন,—আছি। একটা তলোয়ার

প্রতাপ বলিল,—ভীম, সর্দারকে তলোয়ার দাও।

ভীম তেজ সিংকে তলোয়ার দিল, প্রতাপ নিজের কোমর হইতে অসি কোষমুক্ত করিল।

প্রতাপ বলিল,—আমি শপথ করছি যদি আপনি আমাকে পরাস্ত করতে পারেন তাহলে বিনা শর্তে মুক্তি পাবেন, আমার সঙ্গীরা কেউ আপনাকে ধরে রাখবে না। আর আপনি শপথ করুন যদি পরাস্ত হন তাহলে পালাবার চেষ্টা করবেন না।

তেজ সিং বলিলেন,—শপথ করছি।

অতঃপর অসিযুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয় যোদ্ধা প্রায় সমকক্ষ, তেজ সিংয়ের অসিবিদ্যায় পটুত্ব বেশী, প্রতাপের বয়স কম। বেশ কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলিল; ক্রমে তেজ সিং ক্লান্ত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। নিজের আসন্ন অবসন্নতা অনুভব করিয়া তিনি অন্ধবেগে আক্রমণ করিলেন। প্রতাপ তখন সহজেই তাঁহাকে পরাভূত করিয়া ধরাশায়ী করিল।

প্রতাপ হাত ধরিয়া তেজ সিংকে ভূমি হইতে তুলিল; কিছুক্ষণ দুইজনে নিষ্পলক দৃষ্টি বিনিময় করিলেন। তেজ সিংয়ের দৃষ্টিতে পরাভবের তিক্ততার সহিত সম্ভ্রম মিশিল। তিনি বলিলেন,-

প্রতাপ সিং, তোমার কাছে পরাস্ত হয়েছি। আমার শপথ মনে রাখব।

6

দ্বিপ্রহরের খররৌদ্রে চারিদিক মুহ্যমান। পাহাড়ের অঙ্গ হইতে উত্তাপ প্রতিফলিত হইতেছে। ছায়া বিবরসন্ধী সর্পের মত পাথরের খাঁজে খাঁজে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছে।

এই সময় নির্জন পার্বত্যপথ দিয়া এক পথিক চলিয়াছিল। পথিক অন্ধ, ষষ্টি ধরিয়া ধীরপদে চলিতেছিল। তাহার দেহ দীর্ঘ ও ঋজু, কিন্তু বয়স ও দারিদ্রের প্রকোপে কঙ্কালমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে। তাহাকে দেখিয়া ভিক্ষুক বলিয়া মনে হয়।

অন্ধ ভিক্ষুক থাকিয়া থাকিয়া উচ্চকণ্ঠে হাঁকিয়া উঠিতেছিল,

প্রতাপ বারবটিয়া—প্রতাপ বারবটিয়া—তুমি কোথায়?

জনহীন আবেষ্টনীর মধ্য হইতে জিজ্ঞাসার কোনও উত্তর আসিতেছিল না; কিন্তু ভিক্ষুক সমভাবে হাঁকিয়া চলিয়াছে—

প্রতাপ বারবটিয়া! তুমি কোথায়?

বিসর্পিল পথে ভিক্ষুক এইভাবে অনেকদূর চলিল।

পথের পাশে একস্থানে কয়েকটি বড় বড় পাথরের চাঁই একত্র হইয়া আপন ক্রোড়দেশে একটু ছায়ার সৃষ্টি করিয়াছিল। এই ছায়ার কোটরে বসিয়া পুরন্দর আপন মনে আঙুলে আঙুল জড়াইয়া খেলা করিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া মনে হয় না তাহার কোনও কাজ আছে; গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নের অফুরন্ত অবকাশ এমনি হেলাফেলায় কাটাইয়া দেওয়াই যেন তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। এই অলস নৈষ্কর্মের মধ্যেও তাহার চক্ষুকর্ণ যে সজাগ হইয়া আছে তাহা সহজে লক্ষ্য করা যায় না।

দূর হইতে কঠিন পথের উপর লাঠির ঠক্ শব্দ কানে যাইতেই পুরন্দর সোজা হইয়া বসিল; পরক্ষণেই সে ভিক্ষুকের উচ্চ চিৎকার শুনিতে পাইল

প্রতাপ বারবটিয়া, তুমি কোথায়?

পুরন্দর একবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল কিন্তু উঠিল না, যেমন বসিয়াছিল তেমনি বসিয়া রহিল। ক্রমে ভিক্ষুক লাঠির শব্দ করিতে করিতে তাহার সম্মুখ দিয়া যাইতে লাগিল। পুরন্দর তথাপি নড়িল না, কেবল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভিক্ষুককে পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

ভিক্ষুক তাহাকে অতিক্রম করিয়া যাইবার পর পুরন্দর নিঃশব্দে উঠিল, পা টিপিয়া টিপিয়া গিয়া পিছন হইতে তাহার স্কন্ধ স্পর্শ করিল।

ভিক্ষুক দাঁড়াইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া প্রশ্ন করিল,-

কে তুমি? প্রতাপ বারবটিয়া?

পুরন্দর সম্মুখে আসিয়া ভিক্ষুকের মুখ এবং মণিহীন অক্ষিকোটর ভাল করিয়া পরীক্ষা করিল। বলিল,-

তুমি অন্ধ?

ভিক্ষুক বলিল,-হ্যাঁ, তুমি কে?

পুরন্দর বলিল,-আমি যেই হই, প্রতাপ বাবটিয়ার সঙ্গে তোমার কি দরকার?

ভিক্ষুক বলিল,-দরকার আছে বড় জরুরী দরকার।

পুরন্দর প্রশ্ন করিল,—কী দরকার আমায় বলবে না?

ভিক্ষুক বলিল,-তুমি যদি প্রতাপ বারবটিয়া হও তোমাকে বলতে পারি।

পুরন্দর বলিল,-আমি প্রতাপ নই কিন্তু তোমাকে তার কাছে নিয়ে যেতে পারি। যাবে?

ভিক্ষুক বলিল,-যাব। তার কাছে যাব বলেই তো বেরিয়েছি। কিন্তু আমি অন্ধ

পুরন্দর বলিল,-বেশ, আমার সঙ্গে এস।

পুরন্দর ভিক্ষুকের ষষ্টির অন্য প্রান্তে তুলিয়া নিজমুষ্টিতে ধরিয়া আগে আগে চলিল, ভিক্ষুক তাহার পশ্চাৎবর্তী হইল।

.

গুহার সম্মুখে একখণ্ড প্রস্তরের উপর প্রতাপ ও তেজ সিং পাশাপাশি বসিয়া আছেন। তাঁহাদের পিছনে তিলু, ভীম, নানাভাই ও প্রভু দাঁড়াইয়া আছে। সম্মুখে কিছু দূরে অন্ধ ভিক্ষুক ঋজু দেহে দাঁড়াইয়া বলিতেছে,-

প্রতাপ বারবটিয়া, তোমার দেশের লোক যদি না খেয়ে মরে যায় তাহলে তুমি কেন রাজদ্রোহী হয়েছ? অন্ন যদি চাষীর পেটে না গিয়ে মহাজনের গুদামে জমা হয়, তবে কিসের জন্য তুমি দস্যুবৃত্তি গ্রহণ করেছ?

প্রতাপ প্রশ্ন করিল,—তুমি কে? কোথা থেকে আসছ?

ভিক্ষুক বলিল,-আমি মিঠাপুর গ্রামের লোক। মিঠাপুর এখান থেকে দশ ক্রোশ উত্তরে। গ্রামের যিনি জমিদার তিনিই মহাজন। এবার ফসল ভাল হয়নি তাই জমিদার খাজনার বাবদ প্রজার সমস্ত ফসল বাজেয়াপ্ত করে নিজের আড়তে তুলেছেন, আর চতুগুণ মূল্যে তাই প্রজাদের বিক্রি করছেন। প্রজাদের যতদিন ক্ষমতা ছিল, গাই বলদ কাস্তে লাঙল

বিক্রি করে নিজের তৈরি শস্য মহাজনের কাছ থেকে কিনে খেয়েছে। কিন্তু এখন আর তাদের কিছু নেই—তারা সর্বস্বান্ত হয়েছে। মহাজনও তাদের শস্য দেওয়া বন্ধ করে দিয়ে শহরে মাল চালান দিচ্ছেন; অসহায় দুর্বল চাষীরা অনাহারে মরছে। প্রতাপ বারবটিয়া, তাই আমি তোমাকে খুঁজতে বেরিয়েছি—আমি জানতে চাই এর প্রতিকার কি তুমি করবে না?

শুনিতে শুনিতে প্রতাপের মুখ কঠিন হইয়া উঠিতেছিল। সে তেজ সিংয়ের দিকে ফিরিল, কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব নম্র করিয়া বলিল,-

সর্দারজী, আপনি রাজকর্মচারী, এর প্রতিকার আপনিই করুন। এই লোকটির চেহারা দেখেই বুঝতে পেরেছেন ওদের কি অবস্থা হয়েছে। দেশে রাজা আছে, আইন আছে, আদালত আছে—এই ক্ষুধার্তদের প্রাণ বাঁচাবার ন্যায়সঙ্গত রাস্তা আপনি বলে দিন।

তেজ সিং মাথা হেঁট করিলেন,

আইনের কোনও হাত নেই।

প্রতাপ বলিল,-তাহলে এতগুলো মানুষের প্রাণরক্ষার জন্য আপনারা কিছুই করতে পারেন না?

তেজ সিং হেঁট মুখে রহিলেন, উত্তর দিলেন না। প্রতাপ উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল,–

বেশ, তাহলে আমরাই ওদের প্রাণরক্ষা করব। রাজশক্তি যখন পঙ্গু তখন রাজদ্রোহীরাই রাজার কর্তব্য পালন করবে। ভীম, তৈরি হও তোমরা।

ভীম, নানা, প্রভু ও পুরন্দর যাত্রার আয়োজন করিতে চলিয়া গেল। তেজ সিং মুখ তুলিলেন, বলিলেন,-

কি করতে চান আপনারা?

প্রতাপ বলিল—ক্ষুধার্তের অন্ন ক্ষুধার্তকে ফিরিয়ে দেব। কাজটা আইনসঙ্গত হবে না। কিন্তু আইনের চেয়ে মানুষের জীবনের মূল্য আমাদের কাছে বেশী। আপনি আসবেন আমাদের সঙ্গে? ভয় নেই, আপনাকে ডাকাতি করতে হবে না; শুধু দর্শক হিসাবে যাবেন। আমরা কিভাবে ডাকাতি করি স্বচক্ষে দেখলে হয়তো আমাদের খুব বেশী অধম মনে করতে পারবেন না।

তেজ সিং উঠিয়া দাঁড়াইলেন,

বেশ, যাব আপনাদের সঙ্গে।

প্রতাপ তিলুর দিকে ফিরিয়া ইঙ্গিত করিল।

তিলু —

এই যে প্রতাপভাই—

তিলু দ্রুতপদে গুহার মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রতাপ তখন দূরে দণ্ডায়মান ভিক্ষুকের কাছে গিয়া তাহার স্কন্ধে হাত রাখিল। বলিল,-

ভাই, আমরা যাচ্ছি। যতক্ষণ না ফিরি তুমি এইখানেই থাকো। তুমি ক্ষুধার্ত, তিলুবেন তোমাকে খেতে দেবেন।

অন্ধের অক্ষিকোটর হইতে জল গড়াইয়া পড়িল, সে কম্পিত বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল,–

জয় হোক—তোমাদের জয় হোক।

.

মিঠাপুর গ্রামের জমিদার-মহাজনের কোঠাবাড়ির সম্মুখভাগ। খর্বাকৃতি পুষ্টোদর শেঠজী বাড়ির বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন, তিনটি গরুর গাড়িতে শস্যের বস্তা লাদাই হইতেছে। কুলি মজুর ছাড়াও দশবারো জন লাঠিয়াল সশস্ত্রভাবে দাঁড়াইয়া এই লাদাইকার্য তদারক করিতেছে।

গ্রাম্যপথের অপর পাশে মাঠের উপর একদল গ্রামবাসী দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের শীর্ণ শরীরে বস্ত্রের বাহুল্য নাই, চোখে হতাশ বিদ্রোহের ধিকিধিকি আগুন। জীবনধারণের একমাত্র উপকরণ চোখের সম্মুখে স্থানান্তরিত হইতেছে অথচ তাহাদের বাধা দিবার ক্ষমতা নাই।

গরুর গাড়িতে বস্তা চাপানো সম্পূর্ণ হইলে শেঠ হাত নাড়িয়া ইশারা করিলেন; তখন বৃহৎ শৃঙ্গধর বলদের দ্বারা বাহিত শকটগুলি চলিতে আরম্ভ করিল। লাঠিয়ালেরা গাড়িগুলির দুই পাশে সারি দিয়া চলিল।

এই সময় গ্রামবাসীদের মধ্যে একজন আর স্থির থাকিতে পারিল না, ছুটিয়া আসিয়া প্রথম গাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহার কোটরপ্রবিষ্ট চোখে উন্মাদের দৃষ্টি; হস্ত আস্ফালন করিয়া সে চিৎকার করিয়া উঠিল,

না—যেতে দেব না—আমাদের ফসল নিয়ে যেতে দেব না। আমরা খাব কী? আমাদের ছেলে বৌ খাবে কি?

বারান্দার উপর শেঠ শুনিতে পাইয়া ক্রুদ্ধস্বরে হুকুম দিলেন,

মার মার হতভাগাকে মেরে তাড়িয়ে দে

একজন লাঠিয়াল আগাইয়া আসিয়া লাঠির গুঁতা দিয়া হতভাগ্যকে পথের পাশে ফেলিয়া দিল।

সহসা বন্দুকের গুড়ুম শব্দ হইল। লাঠিয়ালটা পায়ে আহত হইয়া বাপরে বলিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল।

ছয়জন অশ্বারোহী আসিয়া গরুর গাড়ির পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। ছয়জনের মধ্যে চারজনের হাতে বন্দুক, প্রতাপের কোমরে পিস্তল, তেজ সিং নিরস্ত্র। প্রতাপ সঙ্গীদের বলিল,-

তোমরা এদের আটক রাখো—আমরা মহাজনের সঙ্গে কথা কয়ে আসি। আসুন সর্দারজী।

প্রতাপ ও তেজ সিং ঘোড়া হইতে নামিয়া বাড়ির বারান্দার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। শেঠ বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া ভয় পাইয়াছিলেন, মাত্র দুইজন নিরস্ত্র লোক দেখিয়া তাহার সাহস কতকটা ফিরিয়া আসিল। তাঁহার অনেক লোকলস্কর লাঠিয়াল আছে, দুইজন লোককে তাঁহার ভয় কি? তিনি রুক্ষদৃষ্টিতে তাহাদের পানে চাহিলেন। প্রতাপ কাছে আসিয়া নম্রকণ্ঠে বলিল,-

আপনিই কি গ্রামের শেঠ?

শেঠ বলিলেন,—হ্যাঁ। তোমরা কে?

প্রতাপ উত্তর না দিয়া পুনশ্চ প্রশ্ন করিল,

এই যে ফসল চালান দিচ্ছেন এ কি আপনার ফসল?

সে খবরে তোমার দরকার কি? তুমি কে?

প্রতাপ সবিনয়ে বলিল,-আমি প্রতাপ বারবটিয়া।

ঝাঁটার প্রহারে মাকড়সা যেমন কুঁকড়াইয়া যায়, নাম শুনিয়া শেঠও তেমনি কুঁচকাইয়া গেলেন, প্রতাপের পিস্তলটার প্রতি হঠাৎ তাঁহার নজর পড়িল।

প্রতাপ নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলিল,-প্রজারা খেতে পাচ্ছে না, এ সময় ফসল চালান দেওয়া কি আপনার উচিত হচ্ছে?

শেঠ ঢোক গিলিতে গিলিতে বলিলেন,—আমি—আমার—এঁ—প্রজারা দাম দিতে পারে না—তাই

প্রতাপ একটু হাসিল; তাহার একটা হাত অবহেলাভরে পিস্তলের মুঠের উপর পড়িল। সে বলিল,-

হুঁ। আপনি প্রজাদের ফসল বাজেয়াপ্ত করে সেই ফসল দশগুণ দরে তাদেরই বিক্রি করছেন। এখন তারা নিঃস্ব। তাই তাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে আপনি বাইরে মাল চালান দিচ্ছেন

ভয়ে শেঠের নাভি পর্যন্ত শুকাইয়া উঠিয়াছিল। তিনি সামান্য গ্রাম্য মহাজন, চাষীদের উপর যতই দাপট হোক, প্রতাপ বারবটিয়ার সহিত বাক্-যুদ্ধ করিবার সাহস তাঁহার নাই। তিনি একেবারে কেঁচো হইয়া গিয়া কাঁদো কাঁদো সুরে বলিলেন,–

আমার দোষ হয়েছে কসুর হয়েছে, এবারটি আমায় ক্ষমা করুন। আপনি আমায় যা বলবেন তাই করব।

প্রতাপ তাহার মুখের পানে চাহিয়া ক্ষণেক বিবেচনা করিল।

আপনি প্রজাদের কাছ থেকে যে লাভ করেছেন তাতে আপনার বকেয়া খাজনা শোধ হয়ে গেছে? সত্যি কথা বলুন।

শেঠ বলিল,-অ্যা–হ্যাঁ শোধ হয়ে গেছে।

প্রতাপ বলিল,-তাহলে এখন আপনার ঘরে যা ফসল আছে তা উপরি। কত ফসল আছে?

তা—তা—

সত্যি কথা বলুন। নইলে ফসল তো যাবেই, আপনার ঘরবাড়িও আস্ত থাকবে না।

পাঁচশো মণ আছে—পাঁচশো মণ।

বেশ, এই পাঁচশো মণ ফসল ন্যায্য অধিকারীদের ফিরিয়ে দিতে হবে।

শেঠ ক্রন্দনোন্মুখ হইয়া বলিলেন,—সবই যদি ফিরিয়ে দিই তবে সারা বছর আমি খাব কি?

প্রতাপ বলিল,-পাঁচজনের মত আপনিও কিনে খাবেন। এখন আসুন আমার সঙ্গে।

ওদিকে গরুর গাড়িগুলি এতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল, লাঠিয়ালেরা সম্মুখে বন্দুকধারী ঘোড়সওয়ার দেখিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল, আহত লাঠিয়ালটা আহত গ্রামবাসীর পাশে বসিয়া মৃদু মৃদু কুন্থন করিতেছিল। এখন শেঠ মহাশয় প্রতাপ ও তেজ সিংয়ের মধ্যবর্তী হইয়া পথের উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন।

প্রতাপ বলিল,-আপনার লাঠিয়ালদের সরে যেতে বলুন।

শেঠ হাত নাড়িয়া বলিলেন,—ওরে তোরা সব সরে যা।

লাঠিয়ালেরা বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া সরিয়া গেল। আহত লাঠিয়ালটা হামাগুড়ি দিয়া তাহাদের অনুগামী হইল।

প্রতাপ বলিল,-এবার বলুন—প্রজাদের দিকে ফিরে বলুন—

প্রতাপ নিম্নস্বরে বলিতে লাগিল, শেঠ মন্ত্র পড়ার মত আবৃত্তি করিতে লাগিলেন,

ভাই সব—তোমাদের পাঁচশো মণ ফসল আমার কাছে গচ্ছিত আছে—তোমাদের যখন ইচ্ছে তোমরা সে ফসল নিয়ে যেয়ো (ঢোক গিলিয়া)—দাম দিতে হবে না। উপস্থিত এই তিন গরুরগাড়ি মাল তোমরা নিয়ে যাও

প্রজারা ক্ষণকালের জন্য নিশ্চল হতবুদ্ধি হইয়া রহিল, তারপর চিৎকার শব্দে গগন বিদীর্ণ করিয়া গরুর গাড়ি তিনটির উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

প্রতাপ তেজ সিংয়ের পানে চাহিয়া পরিতৃপ্তির হাসি হাসিল। তেজ সিং মাথা হেঁট করিলেন।

7

কয়েকদিন পরের ঘটনা।

চিন্তার পরপে সূর্যাস্ত হইতে বিলম্ব নাই। বারান্দার কিনারায় দাঁড়াইয়া চিন্তা একজন পথিকের অঞ্জলিবদ্ধ হস্তে জল ঢালিয়া দিতেছে। সন্ধ্যার পর পরপে আর কেহ আসে না, এই লোকটি বোধ হয় শেষ রাহী।

জল পান শেষ করিয়া পথিক যখন মুখ তুলিল তখন দেখা গেল, সে কান্তিলাল। কান্তিলাল আজ সুযোগ পাইয়া একাকী পরপে আসিয়াছে।

মুখ মুছিতে মুছিতে সে চিন্তার দিকে চোখ বাঁকাইয়া বেশ একটু ভঙ্গিমা সহকারে হাসিল, বলিল,–

কি পানিহারিন, পুরোনো রাহীকে চিনতেই পারছ না নাকি?

চিন্তা কান্তিলালকে বিলক্ষণ চিনিয়াছিল, সে গম্ভীর বিরক্তমুখে বলিল,–

জল খেলে, এবার নিজের কাজে যাও।

কান্তিলাল বারান্দার কিনারায় বসিল,–

সূয্যি ডুবতে চলল, এখন আর আমার কাজ কি? কথায় বলে, দিনের চাকর রাতের নাগর। এস দুদণ্ড বসে কথা কই

চিন্তা বলিল,-আমি সরকারের চাকর, যতক্ষণ সূর্য আকাশে থাকবে ততক্ষণ রাহীদের জল দিয়ে সেবা করা আমার কাজ। কিন্তু এখন আর আমি কারুর চাকর নই

কান্তিলাল বলিল,-আহা সেই কথাই তো বলছি পানিহারিন্! এখন তোমারও কাজ ফুরিয়েছে আমারও কাজ ফুরিয়েছে—একটু আমোদ করার এই তো সময়। নাও, বসো এসে—আজ আর এপথে কেউ আসছে না।

কান্তিলাল পদদ্বয় বারান্দার উপর তুলিয়া আরও জুত করিয়া বসিল।

চিন্তা কঠিন স্বরে বলিল,-যাও বলছি–নইলে—

কান্তিলাল এতক্ষণ নরম সুরে কথা বলিতেছিল, কিন্তু যখন দেখিল মিষ্টি কথায় চিড়া ভিজিবে না তখন সে মনের জঘন্যতা উদঘাটিত করিয়া হাসিল। বলিল,–

অত ছলকলায় দরকার কি পানিহারিন্! তুমিও জানো আমি কি চাই আর আমিও জানি তুমি কি চাও

চিন্তা বাহিরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল,-

যাও—ভাল চাও তো এখনই যাও

কান্তিলাল বলিল,-আর যদি না যাই? কি করবে? জোর করে তাড়িয়ে দিতে পারবে? বেশ—চলে এস—দেখি তোমার গায়ে কত জোর— বলিয়া কান্তিলাল কৌতুকভরে বাহ্বাস্ফোট করিয়া উচ্চহাস্য করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার হাস্য দীর্ঘস্থায়ী হইল না; এই সময় একটি বলিষ্ঠ হস্ত আসিয়া তাহার কর্ণধারণপূর্বক এমন সজোরে নাড়া দিল যে কান্তিলালের হাসি মুদারাগ্রাম ছাড়িয়া কাতরোক্তির তারাগ্রামে গিয়া উঠিল।

কে রে তুই? ছাড় ছাড়

কর্ণধারণ করিয়াছিল নানাভাই। নানাভাইয়ের সাজ-পোষাক সাধারণ পথিকের মতই, উত্তরীয়ের একপ্রান্তে একটি মধ্যমাকৃতি পুঁটুলি পিঠের উপর ঝুলিতেছে। নানাভাই চিন্তার পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল,—

পানিহারিন, লোকটা কি তোমাকে বিরক্ত করছে?

চিন্তা নীরবে ঘাড় নাড়িল। কান্তিলালের কান তখনও নানার আঙুলের জাঁতিকলে ধরা ছিল, সে উঠিবার চেষ্টা করিতে করিতে তর্জন করিল,

কে তুই? এতবড় আস্পর্ধা

নানাভাই কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া কান্তিলালকে কান ধরিয়া টানিয়া দাঁড় করাইল। বলিল,–

আমিও তোর মত একজন রাহী কিন্তু তোর মত ছোটলোক নই। যা, আর এখানে দাঁড়ালে বেইজ্জত হয়ে যাবি।

বেইজ্জত!

হ্যাঁ, তোর নাক কান কেটে নেব। –যা

নানাভাই কান ছাড়িয়া দিল। কান্তিলাল দেখিল আততায়ীর চেহারা যেমন নিরেট, চোখের দৃষ্টিও তেমনি কড়া। সে আর বাগ-বিতণ্ডায় সময় নষ্ট করিল না, পদাহত কুকুরের মত পলায়ন করিল। যাইবার সময় চিন্তার পানে একটা বিষাক্ত অপাঙ্গ-দৃষ্টি হাসিয়া অস্ফুটকণ্ঠে বলিয়া গেল,

আচ্ছা

কান্তিলাল অদৃশ্য হইয়া গেলে নানাভাই পুঁটুলি নামাইয়া বারান্দার ধারে বসিল। বলিল,–

চিন্তাবেন, দেশে পাজি লোকের অভাব নেই, তুমি সাবধানে থাকো তো?

চিন্তা বলিল,-ভয় নেই, দরকার হলে আমার কাটারি আছে। কিন্তু তোমার পুঁটুলিতে ও কী নানাভাই?

নানাভাই বলিল,—আর বল কেন? তিলুবেনের কুড়মুড়া খাবার ইচ্ছে হয়েছিল তাই অনেক সন্ধান করে নিয়ে যাচ্ছি।

চিন্তা হাসিয়া বলিল,-আহা বেচারা! নানাভাই, তোমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে। আজ সকালে ঝরনায় জল ভরতে গিয়ে–। কিন্তু আগে তোমায় জলপান দিই, তারপর বলব।

.

রাত্রিকাল। দস্যুদের গুহার অভ্যন্তর। কয়লার গগনে আগুনের সম্মুখে বসিয়া তিলু মোটা মোটা বাজরির রুটি সেঁকিতেছে। নানাভাই ছাড়া আর সকলে আগুন ঘিরিয়া বসিয়াছে; দিনের বেলা যতই গরম হোক, রাত্রে এই পাহাড়ের অধিত্যকায় বেশ ঠাণ্ডা পড়ে। হাতে কোন কাজ নাই, তাই সকলে মিলিয়া তিলুকে খেপাইতেছিল; এমন কি তেজ সিংও গম্ভীর মুখে এই কৌতুকে যোগ দিয়াছিলেন।

পুরন্দর উদ্বিগ্নমুখে বলিল,-নানাভাই এখনও ফিরল না—

প্রভু বলিল,— হুঁ-রাত কম হয়নি।

ভীমভাই একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল। বলিল,-

বলতে নেই হয়তো ধরা পড়ে গেছে

তিলু দুই হাতে রুটি গড়িতে গড়িতে ক্রুদ্ধ চোখে তাহার পানে চাহিল। বলিল,-

যা তা বোলো না। নানাভাই এখনি ফিরে আসবেন। তিনি বলে গেছেন তাঁর ফিরতে একটু দেরি হতে পারে।

তেজ সিং বলিলেন,—কাজটা ভাল হয়নি তিলুবেন। নানাভাইয়ের মত একজন দুর্দান্ত ডাকাতকে মুড়ি আনতে পাঠানো— তিনি দুঃখিতভাবে মাথা নাড়িলেন।

প্রতাপ উদাসকণ্ঠে বলিল,-হয়তো সেই লজ্জাতেই নানাভাই দল ছেড়ে চলে গেছে। হাজার হোক বীরপুরুষ তো। তাকে মুড়ি আনতে বলা— প্রতাপও মাথা নাড়িল।

সকলে দুঃখিতভাবে মাথা নাড়িল। তিলুর মুখ কাঁদো কাঁদো হইয়া উঠিল, সে হাতের রুটি রাখিয়া কাতরকণ্ঠে বলিল,-

আমি বলিনি—আমি বলিনি নানাভাইকে মুড়ি আনতে। আমি খালি বলেছিলাম

পুরন্দর বলিল,—তুমি যা বলেছিলে সে তো আমরা সবাই শুনেছি। সেকথা শোনবার পর নানাভাইয়ের মত একজন কোমলপ্রাণ ডাকাত কি আর স্থির থাকতে পারে! সে না গেলে আমি যেতাম

ভীমভাই বলিল,-কেউ না গেলে শেষ পর্যন্ত আমাকেই যেতে হয়। বলতে নেই—

তিলু ব্যাকুলনেত্রে সকলের মুখের পানে চাহিতে চাহিতে তেজ সিংয়ের ঠোঁটের কোণে একটু হাসি লক্ষ্য করিয়া হঠাৎ বুঝিতে পারিল সকলে তাহাকে লইয়া তামাশা করিতেছে। তিলুর সমস্ত রাগ গিয়া পড়িল ভীমভাইয়ের উপর। একদলা বাজরির নেচি তুলিয়া লইয়া সে ভীমভাইকে ছুঁড়িয়া মারিল।

এই সময় গুহামুখে মানুষের গলার আওয়াজ হইল; আওয়াজ গুহার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইয়া ভয়ঙ্কর শুনাইল

হুঁশিয়ার!

সকলে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু ভয়ের কারণ ছিল না; পরক্ষণেই নানাভাই আলোকচক্রের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে একটি স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোকের চক্ষু কাপড় দিয়া বাঁধা।

নানাভাই বলিল,-প্রতাপ বারবটিয়া, একজন স্ত্রীলোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায় বলিয়া চোখের কাপড় খুলিয়া দিল। সকলে চমৎকৃত হইয়া দেখিল—চিন্তা।

প্রতাপ হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে বলিল,-চিন্তা!

তিলু একঝাঁক ছাতারে পাখির মত আনন্দকুজন করিতে করিতে ছুটিয়া গিয়া চিন্তাকে জড়াইয়া ধরিল।

অতঃপর চিন্তার প্রথম গুহায় আগমনের আনন্দ-সংবর্ধনা কথঞ্চিৎ শান্ত হইলে সকলে আবার আগুন ঘিরিয়া বসিয়াছে এবং পরম তৃপ্তির সহিত মুড়ি চিবাইতেছে। চিন্তার একপাশে প্রতাপ, অন্যপাশে তিলু তাহার একটা বাহু দৃঢ়ভাবে ধরিয়া আছে, যেন ছাড়িয়া দিলেই সে পায়রার মত উড়িয়া যাইতে পারে।

চিন্তা চারিদিকে চোখ ফিরাইয়া সকলকে দেখিতেছে; তাহার মুখে অসুয়া-বিদ্ধ হাসি

তোমাদের দেখলে আমার হিংসে হয়। আমিও যদি এখানে এসে থাকতে পারতাম!

সকলে অপ্রতিভভাবে নীরব রহিল; ভীমভাই এক খাবলা মুড়ি মুখে ফেলিয়া অর্ধমুদিত নেত্রে চিবাইতে চিবাইতে বলিল,-

আমাদেরই কি সাধ হয় না চিন্তাবেন। তুমি এলে, বলতে নেই, তিলুর রান্না থেকে মাঝে মাঝে কিঞ্চিৎ মুখবদল হত।

সকলের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল; তিলুও হাসিল। চিন্তা নিশ্বাস ফেলিল। বলিল,-

যা হবার নয় তা ভেবে আর কি হবে? আমাকে কিন্তু রাত পোহাবার আগেই ফিরতে হবে। কে আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে?

পুরন্দর বলিল,—সে জন্য ভেবো না বেন। আমরা সবাই মিছিল করে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসব।

প্রতাপ বলিল,-তার এখনও অনেক দেরি আছে। মিছিল করবার দরকার নেই, আমি আর মোতি চিন্তাকে খুব শিগগির পৌঁছে দিতে পারব। আকাশে চাঁদ আছে—

ভীম আস্তেব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল,-

হুঁ হুঁ—আকাশে চাঁদ আছে। বলতে নেই কথাটা এতক্ষণ খেয়ালই হয়নি। দীর্ঘ বিরহের পর তরুণ তরুণীর যখন মিলন হয় তখন তারা কিঞ্চিৎ নিরিবিলি খোঁজে। চল, আমরা বাইরে গিয়ে বসি।

প্রতাপ বলিল,—ভীম, পাগলামি করো না–বসো। চিন্তা, কোনও খবর আছে নাকি?

চিন্তা বলিল,-খবর দিতেই তো এলাম। চিঠিতে অত কথা লেখা যায় না; নানাভাই বললেন মুখে সব কথা না বললে হবে না তাই

প্রতাপ বলিল—কি কথা?

চিন্তা একটু নীরব থাকিয়া বলিতে আরম্ভ করিল,—

আজ সকালে একটা ব্যাপার ঘটেছে। আমি রোজ যেমন জল ভরতে যাই তেমনি ঝরনায় গিয়ে দেখি—

.

ভোরের আলোয় ঝরনার সঞ্চিত জলাশয় ঝিলমিল করিতেছে। চিন্তা কলস কাঁখে জল ভরিতে আসিতেছে; প্রায় জলের কিনারা পর্যন্ত পৌঁছিয়া চিন্তা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখা যায়, একটা অর্ধনিমজ্জিত পাথরের আড়ালে প্রায় এক কোমর জলে দুটি যুবক-যুবতী দাঁড়াইয়া আছে-যুবকের বাঁ হাত যুবতীর ডান হাতের সহিত শক্ত করিয়া দড়ি দিয়া বাঁধা। তাহারা চিন্তাকে দেখিতে পায় নাই, তীরের দিকে পিছন ফিরিয়া ধীরে ধীরে গভীর জলের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

চিন্তার কটি হইতে কলস পড়িয়া গেল; সে অস্ফুট চিৎকার করিয়া ছুটিতে ছুটিতে জলের কিনারায় গিয়া দাঁড়াইল। ইহারা দুইজন যে মৃত্যুপণে আবদ্ধ হইয়া হাতে হাত বাঁধিয়া জলে নামিতেছে তাহা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না।

জলের মধ্যে দুইজন শব্দ শুনিতে পাইয়াছিল, তাহারা চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল। চিন্তাকে দেখিয়া তাহাদের মুখের ভাব পরিবর্তিত হইল; তাহারা যেন মনের মধ্যে মৃত্যুর পরপারে চলিয়া গিয়াছিল, এখন বাধা পাইয়া আবার জীবন্ত-লোকে ফিরিয়া আসিল।

চিন্তা দুই হাত নাড়িয়া তাহাদের ডাকিল।

যুবক-যুবতী কাতরনেত্রে পরস্পরের পানে চাহিল। কি করিবে এখন তাহারা; এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া দেখিতেছে এ অবস্থায় আত্মহত্যা করা যায় না। তাহারা কিছুক্ষণ ইতস্তত করিয়া ধীরে ধীরে তীরের পানে ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

যুবক-যুবতী তীরে আসিয়া একটি পাথরের উপর বসিল। যুবক লজ্জিতমুখে হাতের বন্ধন খুলিয়া ফেলিল। তাহাদের যুবক যুবতী না বলিয়া কিশোর-কিশোরী বলিলেই ভাল হয়; ছেলেটির বয়স কুড়ির বেশী নয়, মেয়েটির পনেরো-যোলো। দুজনেই সুশ্রী, মুখে বয়সোচিত সরলতা মাখানো।

চিন্তা দূরে আর একটি পাথরের উপর বসিয়া করলগ্নকপোলে দেখিতে দেখিতে বলিল,–

তোমাদের বাড়ি কোথায়?

ছেলেটি কুণ্ঠা-লাঞ্ছিত মুখ তুলিল, বলিল,-

দহিসার গ্রামে এখান থেকে প্রায় দু ক্রোশ দূরে—

চিন্তা বলিল,-তোমরা একাজ করতে যাচ্ছিলে কেন?

ছেলেটি কাতরস্বরে বলিল,-আমাদের আর উপায় ছিল না বেন। আমি প্রভাকে বিয়ে করতে চাই—প্রভাও আমাকে

প্রভা কুমারী-সুলভ গর্বে একটু ঘাড় বাঁকাইল।

চিন্তা বলিল,-তারপর?

ছেলেটি বলিল,-প্রভার বাপু পাশের গাঁয়ের মহাজনের কাছে অনেক টাকা ধার করেছেন, শোধ দেবার ক্ষমতা নেই। বুড়ো মহাজন বলেছে তার সঙ্গে প্রভার বিয়ে দিতে হবে, নইলে সে প্রভার বাপুর জমিজমা ঘরবাড়ি সব দখল করে নেবে।

চিন্তা বলিল,-প্রভার বাপু রাজী হয়েছেন?

হু–কাল বিয়ে।

তাই তোমরা আত্মহত্যা করতে এসেছ—

চিন্তা উঠিয়া গিয়া তাহাদের মাঝখানে বসিল, দুহাতে দুজনের স্কন্ধ জড়াইয়া লইয়া বলিল,-

শোনো, তোমরা আত্মহত্যা করো না—গ্রামে ফিরে যাও

দুজনে অবাক হইয়া চিন্তার মুখের পানে চাহিল।

চিন্তা বলিল,-যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। মহাজনের সঙ্গে বিয়ে আমি রদ করবার চেষ্টা করব। যদি না পারি, বিয়ের পর তোমরা যা ইচ্ছে করো—

.

গুহামধ্যে চিন্তা গল্প বলা শেষ করিয়া কহিল,

আমি তাদের আশ্বাস দিয়ে ফেরত পাঠিয়েছি। এখন তাদের জীবন-মরণ তোমাদের হাতে।

প্রতাপ আগুনের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল,-

কাল বিয়ে?

চিন্তা রলিল,-হ্যাঁ, আজ রাত পোহালে কাল বিয়ে।

প্রতাপ তেজ সিংয়ের দিকে ফিরিল।

সর্দারজী, আপনি কি বলেন? মহাজনের সঙ্গে বিয়ে হতে দেওয়া উচিত?

তেজ সিং অপ্রতিভভাবে ক্ষণেক ইতস্তত করিলেন। শেষে বলিলেন,-না।

প্রতাপ বলিল,-কিন্তু আইনে এর কোন দাবাই আছে কি?

তেজ সিং বলিলেন,-না।

প্রতাপ বলিল,-তাহলে জোর করে এ বিয়ে ভেঙে দিই?

তেজ সিং বললেন,—হ্যাঁ।

সকলের মুখে পরিতৃপ্তির হাসি ফুটিয়া উঠিল। ভীমভাই নানাভাইয়ের পেটে গোপনে কনুইয়ের একটি গুঁতা মারিয়া চোখ টিপিল।

.

পরদিন সন্ধ্যা। দহিসার গ্রামে প্রভার পিতৃ-ভবনে সানাই বাজিতেছে। প্রভার পিতা মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থ। তাঁহার বাড়ির উন্মুক্ত অঙ্গনে বিবাহমণ্ডপ রচিত হইয়াছে—গ্রাম্যরীতিতে যতদূর সম্ভব। সুসজ্জিত হইয়াছে। গ্রামের নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা একে একে আসিয়া আসরে বসিতেছেন। বরের আসন এখনও শূন্য রহিয়াছে।

বাড়ির অন্দরে একটি ঘরে অনেকগুলি স্ত্রীলোক বধূ-বেশিনী প্রভাকে ঘিরিয়া বসিয়াছে। সকলে মাঙ্গলিক-গীতি গাহিতেছে, কেহ বা বধূকে সাজাইয়া দিতেছে, কিন্তু কাহারও মুখে হাসি নাই। প্রভা চুপটি করিয়া বসিয়া আছে, মাঝে মাঝে চকিত হরিণীর মত সশঙ্ক-চোখে সকলের মুখের পানে তাকাইতেছে। সে মনে মনে বড় ভয় পাইয়াছে তাহা তাহার মুখ দেখিলেই বোঝা যায়। কাল যখন ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিল তখন তাহার মুখে এমন ভয়ের ছাপ পড়ে নাই।

বাড়ির সদরে বারান্দার এক কোণে একটি ঘরের মধ্যে বর ও বরযাত্রীদের স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। বরের সহিত নাপিত পুরোহিত এবং গুটিকয়েক প্রৌঢ় বরযাত্রী আসিয়াছে। বর রূপচন্দ মহাজনের চেহারাটি পাকানো বংশ-যষ্টির মত, গোঁফ অধিকাংশ পাকিয়া গিয়াছে, গালের শুষ্ক চর্ম কুঞ্চিত হইয়া ভিতর দিকে চুপসাইয়া গিয়াছে, বেশ-ভূষা সমাপ্ত করিয়া

এখন মুখের প্রসাধনে মন দিয়াছেন। কিন্তু মুখখানা কিছুতেই মনের মত হইতেছে না। নাপিত তাঁহার মুখের সম্মুখে একটি ছোট আয়না ধরিয়া রাখিয়াছে, তিনি তাহাতে মুখ দেখিতেছেন এবং নানা ভঙ্গি করিয়া, কী উপায়ে মুখখানাকে উন্নত করা যায়, তাহারই চেষ্টা করিতেছেন।

একটা থালার উপর অনেকগুলি পান রাখা ছিল, বর মহাশয় তাহাই এক থাবা তুলিয়া মুখের মধ্যে পুরিয়া দিলেন, তবু যদি গাল দুটি পরিপুষ্ট দেখায়! অতঃপর চুলের কি করা যায়? মাথায় না হয় পাগড়ি থাকিবে কিন্তু গোঁফের অম্লান পরিপক্কতা ঢাকা পড়িবে কি রূপে? বিভ্রান্তভাবে গোঁফের প্রান্ত ধরিয়া টানিতে টানিতে শেঠ নাপিতকে শুধাইলেন,

কি করি বল না রে! গোঁফজোড়া যে বড্ড সাদা দেখাচ্ছে। কামিয়ে দিবি?

হঠাৎ দ্বারের নিকট হইতে অট্টহাস্যে প্রশ্নের জবাব আসিল। শেঠ চমকিয়া দেখিলেন, একজন পাহাড়ী ঝোলা কাঁধে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার চোখে কাজল, চুলে ধনেশ পাখির পালক। পাহাড়ী হাসিতে হাসিতে বলিল,-

বল কি শেঠ? এ কি বাপের শ্রাদ্ধ করতে এসেছ যে গোঁফ কামিয়ে ফেলবে? আরে ছি ছি ছি। তোমার নতুন বৌ দেখলে বলবে কি?

শেঠ রূপচন্দ নবজাগ্রত কৌতূহলের সহিত আগন্তুককে নিরীক্ষণ করিলেন।–

পাহাড়ী মনে হচ্ছে! জড়িবুটি কিছু জানো নাকি?

পাহাড়ী ঘরে প্রবেশ করিল। বলিল,–

তা জানি বৈ কি। আমার এই ঝোলার মধ্যে এমন চীজ আছে, তোমাকে পঁচিশ বছরের ছোকরা বানিয়ে দিতে পারি শেঠ-পঁচিশ বছরের ছোকরা।

রূপচন্দ উৎফুল্ল হইলেন,—অ্যাঁ—তা বসো বসো। পণ্ডিতজী, লগনের এখনও দেরি আছে তো?

পুরোহিত বলিলেন,-এখনও দুঘড়ি দেরি আছে।

পাহাড়ী বলিল,-আমি এক ঘড়ির মধ্যে তোমার ভোল বদলে দেব শেঠ। কিন্তু তোমার সঙ্গীদের বাইরে যেতে বল, এসব যন্তর-মন্তর একটু আড়ালে করতে হয়

রূপচন্দ বলিলেন,—বেশ তো—বেশ তো। তোমরা সব আসরে গিয়ে বসো, পান তামাক খাও। লগন হলে আমাকে খবর দিও।

সঙ্গীরা সকলে বাহির হইয়া গেল। পাহাড়ী ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া শেঠের সম্মুখে আসিয়া বসিল। শেঠের মুখের পানে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে সে ঝোলার মধ্যে

হাত পুরিয়া একটি ভীষণদর্শন ছোরা বাহির করিয়া সহসা শেঠের বুকের উপর ধরিল। বলিল,-

চুপটি করে থাকো শেঠ। নইলে তোমার চেহারা এমন বদলে যাবে যে কিছুতেই মেরামত হবে না।

পাহাড়ী স্বয়ং প্রতাপ।

.

রাত্রি হইয়াছে, বিবাহমণ্ডপে আলো জ্বলিতেছে। বরযাত্রী কন্যাযাত্রীর সমাগমে আসর ভরিয়া গিয়াছে। বরযাত্রী কয়জন একস্থানে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বসিয়াছেন এবং পান বিড়ি সেবন করিতেছেন।

কন্যার বাপ অবগুণ্ঠিতা কন্যাকে অন্দর হইতে আনিয়া আসরে পিঁড়ির উপর বসাইয়া দিলেন। পুরোহিত কিছু মন্ত্র পড়িলেন, তারপর হাঁকিলেন,-

এবার বরকে নিয়ে এস।

বরযাত্রীরা উঠি উঠি করিতেছেন এমন সময় বর নিজেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বরের পাগড়ি হইতে মুখের উপর শোলার ঝালর ঝুলিতেছে। সকলে সরিয়া গিয়া বরের পথ ছাড়িয়া দিল গিয়া কন্যার সম্মুখে পিঁড়ির উপর বসিলেন।

বরের মুখ যদিও কেহই দেখিতে পাইল না, তবু তাঁহার যুবজনোচিত অঙ্গসঞ্চালন দেখিয়া সকলেই একটু বিস্মিত হইল। একজন বরযাত্রী অন্য একটি বরযাত্রীর কানে কানে বলিল,-

পাহাড়ী ভেলকি দেখিয়ে দিয়েছে একেবারে ঠাট বদলে দিয়েছে–অ্যাঁ!

অতঃপর বিবাহবিধি আরম্ভ হইল, পুরোহিত আড়ম্বর সহকারে অতি দ্রুত মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন। মণ্ডপের আনাচে-কানাচে পাঁচটি লোক উপস্থিত ছিল, কিন্তু কেহ তাহাদের ভাল করিয়া লক্ষ্য করে নাই। তাহারা গ্রামের লোক নয়, কিন্তু অপরিচিত লোক দেখিয়া কেহ কিছু সন্দেহ করে নাই; বরযাত্রীরা ভাবিয়াছিল, তাহারা কন্যাপক্ষীয় লোক এবং কন্যাপক্ষীয়েরা ভাবিয়াছিল, বরযাত্রী ছাড়া আর কে হইতে পারে। বিবাহবাসরে এরূপ ভ্রান্তি প্রায়ই ঘটিয়া থাকে।

নানাভাই, প্রভু, ভীমভাই, পুরন্দর ও তেজ সিং একটি একটি খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া বিবাহক্রিয় দেখিতেছিলেন; প্রতাপ বরকন্যার আসনের কাছে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার আর পাহাড়ী-বেশ নাই, ঝোলা অন্তর্হিত হইয়াছে; কেবল কোমর হইতে একটি মধ্যমাকৃতি থলি ঝুলিতেছে।

পুরোহিত বর বধুর হস্ত সংযুক্ত করিয়া দিয়া তাহার উপর একটি নারিকেল রাখিয়া প্রবল বেগে মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন।

অধঘণ্টা মধ্যে বিবাহক্রিয়া সমাপ্ত হইল।

পুরোহিত ও কন্যার পিতা উঠিয়া দাঁড়াইলেন; পুরোহিত সভার দিকে ফিরিয়া বলিলেন,–

বিবাহবিধিঃ সমাপ্তা। সজ্জনগণ, নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করুন।

সভা হইতে মৃদু হর্ষধ্বনি উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই তাহা নীরব হইল। সকলে দেখিল, একজন অপরিচিত ব্যক্তি বরবধুর নিকটে গিয়া দাঁড়াইয়াছে; ঈষৎ হাসিয়া সে বর ও বধুর মুখ হইতে আবরণ সরাইয়া দিল।

অপরিচিত ব্যক্তির এই স্পর্ধায় সকলেই অসন্তুষ্ট হইত কিন্তু বরের মুখ দেখিয়া তাহা ভুলিয়া গেল। এ তো বৃদ্ধ মহাজন রূপচন্দ নয়; পাহাড়ীর ভেলকিবাজিও শুষ্ক মহাজনকে কুড়ি বছরের কমকান্তি যুবকে পরিণত করিতে পারে না। তাছাড়া যুবকটি গ্রামের সকলেরই পরিচিত। প্রথম বিমুঢ়তার চটকা ভাঙিলে সভা হইতে একজন বলিয়া উঠিল,

আরে এ যে চন্দু—আমাদের পাড়ার চন্দু।

প্রতাপ নত হইয়া প্রভার কানে প্রশ্ন করিল,-

বেন, চোখ তুলে দেখ। বর পছন্দ হয়েছে?

প্রভা একবার শঙ্কা-নিবিড় চোখ দুটি তুলিল, ক্ষণেকের জন্য বিস্ময়ানন্দে তাহার মুখ ভরিয়া উঠিল, তারপর সে চক্ষু নত করিল।

বরযাত্রিগণ এতক্ষণে সংবিৎ ফিরিয়া পাইয়াছিলেন এবং নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিলেন যে বরাসনে যে ব্যক্তি বসিয়া আছে সে আর যে হোক রূপচন্দ মহাজন নয়। তাঁহারা একজোটে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, একজন সক্রোধে প্রশ্ন করিলেন,

এ কি—এ সব কী! আমাদের বর কোথায়?

প্রতাপের মুখে প্রশান্ত হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া মণ্ডপের প্রবেশপথের দিকে দেখাইল।

ছিন্নবাস আলুথালু বেশে শেঠ প্রবেশ করিতেছেন। এখনও তাঁহার হাত হইতে দড়ি ঝুলিতেছে। প্রতাপ তাঁহার মুখ বাঁধিয়া হাত-পা বাঁধিয়া ঘরের মধ্যে রাখিয়া আসিয়াছিল, সেই অবস্থা হইতে তিনি বহুকষ্টে মুক্ত হইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়াছেন। কোনও দিকে দৃকপাত না করিয়া তিনি বরাসনের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। বর-বধুর দিকে জ্বলন্ত অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তিনি শেষে কন্যার পিতার পানে ফিরিলেন—

দাগাবাজ জোচ্চোর! আমাকে এই অপমান! তোর সর্বনাশ করব আমি। তোর ভিটেমাটি চাটি করব—

প্রতাপ শান্ত কণ্ঠে কহিল,

রাগ করো না শেঠ, যা হয়েছে ভালই হয়েছে।

শীর্ণ দেহ ধনুকের মত বাঁকাইয়া শেঠ প্রতাপের পানে ফিরিলেন।

তুই কে রে—তুই কে? অ্যা পাহাড়ী।

প্রতাপের মুখ গম্ভীর হইল, সে গলা চড়াইয়া সকলকে শুনাইয়া বলিল,–

পাহাড়ী নই—আমি প্রতাপ বারবটিয়া।-শেঠ, আমি একলা আসিনি—আমার সঙ্গীরা এই সভাতেই আছে, সুতরাং কেউ গোলমাল করবার চেষ্টা করো না। এই ঘাটের মড়ার সঙ্গে প্রভাবেনের বিয়ে দিলে শুধু প্রভার বাপের নয়, গাঁসুদ্ধ লোকের অধর্ম হত। আমরা সেই অধর্ম থেকে তোমাদের রক্ষা করেছি। কিন্তু এমন কাজ ভবিষ্যতে আর করো না। — মহাজন, তোমার টাকা তুমি ফেরত পাবে, এখন বাড়ি ফিরে যাও। মনে থাকে যেন, প্রভার বাপের ওপর যদি কোনও জুলুম হয় আবার আমরা ফিরে আসব।—প্রভাবেন, এই নাও তোমার বিয়ের যৌতুক, এই দিয়ে তোমার বাপুর ঋণ শোধ করো।

প্রতাপ কোমর হইতে থলি লইয়া প্রভার কোলের উপর একরাশ মোহর ঢালিয়া দিল। সভাসুদ্ধ লোক হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল।

.

চাঁদনী রাত্রি। সুদূরপ্রসারী আবছায়া প্রান্তরের উপর দিয়া প্রতাপের দল ফিরিয়া চলিয়াছে, ছয়টি ঘোড়া পাশাপাশি ছুটিতেছে। তাহাদের সম্মুখে নবোদিত পূর্ণচন্দ্র পূর্বগগনে স্থির হইয়া আছে।

ছুটিতে ছুটিতে একটি ঘোড়া দল হইতে পৃথক হইয়া গেল—সে মোতি। প্রতাপ তাহার পৃষ্ঠ হইতে হাত নাড়িয়া বলিল,-

তোমরা ফিরে যাও—আমি কাল সকালে ফিরব।

প্রতাপ ক্রমে দল হইতে দূরে সরিয়া গেল। দলের পাঁচটি ঘোড়া পাশাপাশি চলিয়াছে—মাঝখানে তেজ সিং। নানাভাই তাঁহার পানে চাহিয়া একটু হাসিল। বলিল,

তৃষ্ণার্ত বিরহী জলের সন্ধানে চলল।

ভীমভাই বিমর্ষভাবে মাথা নাড়িল— বলতে নেই পরের বিয়ে দেখলে মনটা কিঞ্চিৎ খারাপ হয়ে যায়। আমারও তিলুর জন্যে

ভীমের ঘোড়া সকলকে ছাড়াইয়া আগে বাড়িল।

চন্দ্র আকাশে হাসিতেছে।

.

চিন্তার পরপের সম্মুখ দিয়া পথের যে অংশ গিয়াছে, একজন অশ্বারোহী সেই চড়াইপথে পরপের দিকে অগ্রসর হইতেছে। চাঁদের আলোয় দুর হইতে দেখিলে মনে হয় বুঝি প্রতাপ, কিন্তু কাছে আসিলে দেখা যায় কান্তিলাল। খর্বাকৃতি ঘোড়ার পশ্চাদ্ভাগে খেজুরছড়ি দিয়া তাড়না করিতে করিতে কান্তিলাল অভিসারে চলিয়াছে।

পরপের দৃষ্টিসীমার মধ্যে পৌঁছিয়া সে ঘোড়া হইতে নামিল, ঘোড়ার রাস ধরিয়া রাস্তা হইতে কিছু দূরে একটি শুষ্ক বৃক্ষের শাখায় তাহাকে বাঁধিল; তারপর আপন মনে দন্ত বিকীর্ণ করিয়া হাসিতে হাসিতে লঘুপদে পরপের দিকে চলিল।

পরপের বারান্দার উপর জ্যোৎস্না পড়িয়াছে, ঘরের দ্বার রুদ্ধ। কান্তিলাল পা টিপিয়া টিপিয়া বারান্দায় উঠিতে যাইবে এমন সময় দ্রুত অশ্বক্ষুরধ্বনি শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া

পড়িল। ক্ষুরধ্বনি পরপের দিকে আগাইয়া আসিতেছে। কান্তিলাল ক্ষণেক উৎকর্ণ হইয়া শুনিল, তারপর দ্রুত ফিরিয়া গিয়া একটি ঝোপের আড়ালে লুকাইল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রতাপকে মোতির পৃষ্ঠে আসিতে দেখা গেল। কান্তিলাল ঝোপের ফাঁক দিয়া উঁকি মারিয়া প্রতাপকে দেখিল, কিন্তু আবছায়া-আলোতে ঠিক চিনিতে পারিল না। প্রতাপ মোতির পৃষ্ঠ হইতে বারান্দায় নামিয়া মোতিকে ছাড়িয়া দিল, তারপর দ্বারে গিয়া টোকা মারিল।

চিন্তা, দোর খোলো—আমি প্রতাপ।

ঝোপের আড়ালে কান্তিলালের চোখদুটা ধক করিয়া উঠিল। প্রতাপ! প্রতাপ বারবটিয়া! সে আবার ঝোপের ফাঁক দিয়া দেখিল, সম্মুখেই মোতি দাঁড়াইয়া আছে। হ্যাঁ, প্রতাপের ঘোড়াই তো বটে। কান্তিলালের সমস্ত শরীর প্রবল উত্তেজনায় শক্ত হইয়া উঠিল।

ওদিকে চিন্তা দ্বার খুলিয়াছিল; প্রতাপ ভিতরে প্রবেশ করিয়া আবার দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। কান্তিলাল উত্তেজনা-প্রজ্বলিত চোখে শুষ্ক অধর লেহন করিল।

ঘরের ভিতরটি প্রদীপের মৃদু-আলোকে স্নিগ্ধ হইয়া আছে। প্রতাপ ও চিন্তা বাহুতে বাহু জড়াইয়া মুখোমুখি দাঁড়াইয়া আছে। প্রতাপের মুখে একটু করুণ হাসি, চিন্তার সদ্য ঘুমভাঙা চোখে বিস্ময়ানন্দের কিরণ। প্রতাপ যে আজই আবার আসিবে তাহা সে আশা করিতে পারে নাই।

কী হল—প্রভার বিয়ে?

প্রতাপ বলিল,-হয়ে গেল (চিন্তার সপ্রশ্নদৃষ্টির উত্তরে) হাঁ, ঠিক লোকের সঙ্গেই। কিন্তু

চিন্তা বলিল,-কিন্তু কি?

প্রতাপ বলিল,-কিন্তু নয়, সবই ঠিক হয়েছে। কিন্তু ফিরে আসবার পথে মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল—তাই তোমার কাছে চলে এলাম চিন্তা। আজ আবার নতুন করে মনে হল-আমার জীবন কোন্ পথে চলেছে—কোথায় চলেছি আমরা।

প্রতাপের মন কোনও কারণে—কিংবা অকারণেই বিক্ষুব্ধ হইয়াছে বুঝিয়া চিন্তা নীরবে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল। যাহারা দুর্গম পথে একেলা চলে তাহাদের মনে এইরূপ সংশয় মাঝে মাঝে উদয় হয়, চিন্তা জানিত। তাহার নিজের মনেও কতবার কত বিক্ষোভ জাগিয়াছে, কিন্তু তাহা ক্ষণিক; প্রিয়জনের কাছে হৃদয়ভার লাঘব করিতে পারিলেই তাহা কাটিয়া যায়।

বাহিরে কান্তিলাল কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া যখন দেখিল, প্রতাপ বাহিরে আসিল না তখন সে পা টিপিয়া টিপিয়া ঝোপ হইতে বাহির হইল, সিধা বারান্দার দিকে না গিয়া একটু ঘুরিয়া পরপের পিছন দিকে চলিল।

ঘরের পিছনের দেয়ালে সমচতুষ্কোণ ক্ষুদ্র গবাক্ষ; নিম্নে চারিদিকে শুষ্কপত্র ছড়ানো রহিয়াছে; কান্তিলাল অতি সাবধানে গুড়ি মারিয়া জানালার নীচে উপস্থিত হইল। ভিতর হইতে কথাবার্তার আওয়াজ বেশ স্পষ্ট শোনা যায়। কান্তিলাল কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল।

ঘরের ভিতর প্রতাপ ও চিন্তা ঝুলার উপর বসিয়াছে। প্রতাপ বলিয়া চলিয়াছে—

যেদিন প্রথম এ পথে যাত্রা শুরু করেছিলাম সেদিন জানতাম না কোথায় এ-পথ শেষ হবে—তারপর কতদিন কেটে গেল—আজও জানি না এ পথের শেষ কোথায়। তুমি জানো চিন্তা?

চিন্তা বলিল,-ঠিক জানি না! কিন্তু পথে চলাই কি একটা লক্ষ্য নয়?

প্রতাপ বলিল,—হয়তো তাই হয়তো জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পথেই চলতে হবে। নিজের জন্য ভাবি না, কিন্তু তোমার কথা ভেবে বড় দুঃখ হয় চিন্তা! তোমার জীবনটা আমি নষ্ট করে দিলাম। আমি যদি তোমার জীবনে না আসতাম, তুমি হয়তো কোন গৃহস্থকে বিয়ে করে স্বামী-সংসার নিয়ে সুখী হতে

চিন্তা শান্তস্বরে বলিল,-আমার জীবনকে তোমার জীবন থেকে আলাদা করে দেখছো কেন? তুমি কি আমাকে মনের মধ্যে নিজের করে নাওনি?

প্রতাপ বাহু ধরিয়া চিন্তাকে কাছে টানিয়া লইয়া অনুতপ্ত স্বরে বলিল,–আমায় মাপ কর চিন্তা। আমারই ভুল–আমারই ভুল।

জানালার নীচে কান্তিলাল পুর্ববৎ শুনিতেছিল। তাহার মুখ দেখিয়া মনে হয় এরূপ ধরনের কথাবার্তা সে মোটেই প্রত্যাশা করে নাই; দুইজন যুবক-যুবতীর মধ্যে নির্জন গভীররাত্রে যে এরূপ আলোচনা চলিতে পারে ইন্দ্রিয়সর্বর্ষ কান্তিলালের পক্ষে তাহা কল্পনা করাও দুরূহ।

ঘরের মধ্যে প্রতাপ আবার বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল,

তোমার আমার কথা ছেড়ে দিলেও আর একটা কথা আছে চিন্তা। সারা পৃথিবী জুড়ে নির্ধনের ওপর ধনীর এই উৎপীড়ন চলছে, আমরা মুষ্টিমেয় কজন তার কতটুকু প্রতিকার করতে পারি? বুকের রক্ত দিতে পারি, জীবন আহুতি দিতে পারি কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার কতটুকু ফল হবে? মরুভূমিতে একবিন্দু জলের মত আমাদের এই প্রাণপণ চেষ্টা নিমেষে শুকিয়ে যাবে।

চিন্তা ক্ষণেক নীরব রহিল। শেষে বলিল,-

তবে কি এর কোনও উপায় নেই?

প্রতাপ বলিল,-আমি অনেক ভেবেছি, কোনও কুল-কিনারা পাইনি চিন্তা, আমাদের রোগ যেখানে ওষুধও সেখানে। মানুষের সমাজে যতদিন অবস্থার প্রভেদ আছে ততদিন ধনী দরিদ্রকে নির্যাতন করবে, শক্তিমান দুর্বলকে পীড়ন করবে।

তবে?

যদি কখনও এমন দিন আসে যখন মানুষে মানুষে অবস্থার ভেদ থাকবে না, সকলে আপন আপন শক্তি অনুযায়ী কাজ করবে আর সমান বৃত্তি পাবে—সেইদিন মানুষের দুঃখের যুগ শেষ হবে। সেদিন কবে আসবে জানি না—হয়তো কোনদিনই আসবে না।

আসবে। কিন্তু যতদিন না আসে?

প্রতাপ ঈষৎ হাসিয়া বলিল,-ততদিন আমরা লড়াই করে যাব। তুমি এই পরপ থেকে আমার কাছে পায়রার দূত পাঠাবে, আর আমি রাত্রে চোরের মত এসে তোমার সঙ্গে দেখা করে যাব।

ঘরের মধ্যে যখন এইরূপ কথাবার্তা চলিতেছিল কান্তিলাল ধীরে ধীরে উঠিয়া জানালার ভিতর দিয়া উঁকি মারিবার চেষ্টা করিতেছিল। অনবধানে একটি শুষ্কপত্রের উপর পা পড়িতেই মচ করিয়া শব্দ হইল। কান্তিলাল আর দাঁড়াইল না, ক্ষিপ্রপদে পলায়ন করিল।

ঘরের ভিতর প্রতাপ ও চিন্তা আওয়াজ শুনিতে পাইয়াছিল। প্রতাপ লাফাইয়া আসিয়া জানালার বাহিরে গলা বাড়াইল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না। কান্তিলাল তখন দ্রুতগতিতে নিজের ঘোড়ার কাছে পৌঁছিয়াছে।

চিন্তা প্রতাপের পাশে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রতাপ ফিরিয়া বলিল,

কেউ নেই। কিন্তু ঠিক মনে হল—

চিন্তা বলিল,-কোনও জন্তু-জানোয়ার হবে।

ওদিকে কান্তিলাল তখন নিজের ঘোড়ায় চড়িয়া ফিরিয়া চলিয়াছে। তাহার মুখে বিজয়ীর হাসি। খেজুর ছড়ি দিয়া ঘোড়াটাকে পিটাইতে পিটাইতে সে নিজমনেই বলিতেছে,

চল্ চল, ছুটে চল্। আর যাবে কোথায় বারবটিয়া—আর যাবে কোথায় পানিহারিন!

পরপের কক্ষে প্রতাপ চিন্তার কাছে বিদায় লইতেছিল—

এবার যাই চিন্তা। রাত শেষ হয়ে এল, তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও।

চিন্তা একটু হাসিল। প্রতাপ দ্বারের দিকে ফিরিতেছিল, চিন্তা বলিল,-একটা খবর দিতে ভুলে গেছি।

প্রতাপ ফিরিয়া প্রশ্ন করিল,-কী খবর?

চিন্তা বলিল,—সর্দার তেজ সিংয়ের স্ত্রী মর-মর। স্বামী নিরুদ্দেশ হবার পর থেকে তিনি অন্নজল ত্যাগ করেছিলেন, এখন একেবারে শয্যা নিয়েছেন। দুচার দিনের মধ্যে তিনি যদি স্বামীকে ফিরে না পান তাহলে তাঁকে আর বাঁচানো যাবে না।

প্রতাপ কিছুক্ষণ চিন্তা-তন্ময় চোখে চিন্তার পানে চাহিয়া রহিল। তারপর অস্ফুটস্বরে আপনমনেই বলিল,-

বাঁচানো যাবে না—

.

পরদিন প্রভাত।

দস্যুদের গুহামুখে প্রতাপ ও তেজ সিং মুখোমুখি দাঁড়াইয়া আছেন। প্রতাপ একহাতে তেজ সিংয়ের তরবারি, অন্য হাতে সে একটি সজ্জিত অশ্বের বলগা ধরিয়া আছে। কিছু দূরে তিলু ভীম প্রমুখ আর সকলে দাঁড়াইয়া দেখিতেছে।

প্রতাপ বলিল,—এই নিন আপনার তলোয়ার—এখান থেকে ঘোড়ায় চড়ে সটান বাড়ি যাবেন।

তেজ সিং বলিলেন, তুমি আমাকে বিনা শর্তে মুক্তি দিচ্ছ?

প্রতাপ বলিল,—একটি মাত্র শর্ত আছে আপনি পথে কোথাও দাঁড়াবেন না, সিধা বাড়ি যাবেন।

তেজ সিং তরবারি কোমরে বাঁধিলেন।

তেজ সিং বলিলেন,—কেন আমাকে হঠাৎ মুক্তি দিচ্ছ জানি না, কিন্তু এ অনুগ্রহ আমার চিরদিন মনে থাকবে।

প্রতাপ বলিল,-আশা করি আমাদের খুব মন্দ ভাববেন না।

তেজ সিং বলিলেন,—আমি যা চোখে দেখেছি তারপরও যদি তোমাদের মন্দ ভাবি তাহলে ভগবানের চোখে অপরাধী হব। চললাম তিলুবেন, চললাম ভাইসব—তোমাদের কোনওদিন ভুলব না।

তেজ সিং লাফাইয়া ঘোড়ার পিঠে উঠিলেন। তিলুর চোখ দুটি একটু ছলছল করিল।

তিলু বলিল,-আমার বাবা রতিলাল শেঠ মামুদপুরে থাকেন, তাঁর সঙ্গে যদি দেখা হয় বলবেন আমি ভাল আছি।

ভীমভাই বলিল,—আর বলতে নেই যদি সম্ভব হয় তিলুর জন্যে কিছু কুড়মুড়া পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন।

বিদায়ের বিষণ্ণতার উপর হাসির ঝিলিক খেলিয়া গেল।

তেজ সিং বলিলেন,—বেশ, চিন্তাবেনের কাছে পাঠিয়ে দেব। চললাম, আমাকে ভুলো না। যদি কখনও দরকার হয় স্মরণ করো।

তেজ সিং বিদায়-সম্ভাষণে দুই করতল যুক্ত করিলেন। তাঁহার ঘোড়া চলিতে আরম্ভ করিল।

.

দিবা তৃতীয় প্রহর।

চিন্তার পরপের সম্মুখে দুইটি ডুলি আসিয়া থামিল। একটিতে শেঠ গোকুলদাস বিরাজ করিতেছেন, অপরটি শুন্য। ডুলি ঘিরিয়া কান্তিলাল প্রমুখ ছয়জন বন্দুকধারী অশ্বারোহী তো আছেই, উপরন্তু আরও দশ বারো জন সশস্ত্র পদাতি।

গোকুলদাস কান্তিলালের দিকে চোখের ইশারা করিয়া বলিলেন,

দ্যাখ ঘরে আছে কি না।

কান্তিলাল ঘোড়া হইতে নামিয়া পরপের দিকে অগ্রসর হইল।

ঘরের মধ্যে চিন্তা পায়রা দুটিকে শস্য দিতেছিল, তাহারা খুঁটিয়া খাইতেছিল। বাহিরে বহু জনসমাগমের শব্দে সে গলা বাড়াইয়া দেখিল গোকুলদাসের দল, কান্তিলাল ঘরের দিকে আসিতেছে।

কান্তিলাল বারান্দার নিকট আসিয়া দাঁত বাহির করিয়া দাঁড়াইল। চিন্তার মুখ অপ্রসন্ন হইল, কিন্তু সে তাহার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া জলের ঘটি হস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া গোকুলদাসের অভিমুখে অগ্রসর হইল। কান্তিলাল তাহার অনুসরণ করিল না, ঐখানে দাঁড়াইয়া ঘরের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল।

চিন্তা গোকুলদাসের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি জলপানের কোনও চেষ্টা না করিয়া নির্নিমেষ সর্প-চক্ষু দিয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন। চিন্তা নীরসস্বরে বলিল,-

জল নাও

গোকুলদাস পূর্ববৎ অজগরের সম্মোহন-চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া রহিলেন, তারপর সহসা বন্দুকের গুলির মত প্রশ্ন করিলেন,

তুই প্রতাপ বারবটিয়ার গোয়েন্দা।

চিন্তার হাত হইতে ঘটি পড়িয়া গেল। সে সভয়ে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, পদাতি লোকগুলি তাহাকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ধরিয়াছে; পলাইবার পথ নাই।

গোকুলদাস ডুলি হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, অনুচরদের হুকুম দিলেন,

এর হাত চেপে ধর।

দুইজন পদাতি চিন্তার দুই হাত চাপিয়া ধরিল; তখন গোকুলদাস তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া কর্কশস্বরে বলিলেন,-

শয়তান ছুঁড়ি, তোর সব কেচ্ছা জানি। প্রতাপ বারবটিয়া তোর নাগর রাত্রে লুকিয়ে তোর সঙ্গে দেখা করতে আসে। আর তুই পায়রা উড়িয়ে তাকে খবর পাঠাস্! অ্যাঁ!

চিন্তা রুদ্ধস্বরে বলিল,-আমি কিছু জানি না।

গোকুলদাস বলিলেন,-জানি না?—দে তো ওর হাতে মোচড়, কেমন জানে না দেখি।

পদাতিদ্বয় চিন্তার হাতে মোচড় দিল, চিন্তা যন্ত্রণায় কাতরোক্তি করিয়া উঠিল।

গোকুলদাস বলিলেন,—এখনি হয়েছে কি, তোর অনেক দুর্গতি করব। তুই সরকারের নিমক খাস আর বারবটিয়ার গোয়েন্দাগিরি করিস! ভাল চা তো বল, প্রতাপ বারবটিয়া কোথায় থাকে তাহলে তোকে ছেড়ে দেব। বলবি?

চিন্তা বলিল,-আমি কিছু জানি না।

গোকুলদাস পদাতিদের ইশারা করিলেন,তাহারা আবার চিন্তার হাতে মোচড় দিল। এবার চিন্তা চিৎকার করিল না, অধর দংশন করিয়া নীরব রহিল।

গোকুলদাস বলিলেন,—বলবি?

চিন্তা পাংশু মুখে বলিল,—আমি কিছু জানি না।

গোকুলদাস হাসিলেন; তিনি ইহার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন। বলিলেন,–

ওর মুখ বেঁধে ডুলিতে তো। পদাতিরা চিন্তার মুখ বাঁধিয়া দ্বিতীয় ডুলির মধ্যে ফেলিল।

গোকুলদাস বলিলেন,—তুই ভেবেছিস, তুই না বললে তোর নাগরকে ধরতে পারব না? তোকে যখন ধরেছি তখন সে যাবে কোথায়! কান্তিলাল, একটা পায়রা ধরে আন।

কান্তিলাল বলিল,-এই যে শেঠ, এনেছি।

সে ইতিমধ্যে চিন্তার ঘরে প্রবেশ করিয়া দুইটি পায়রার মধ্যে একটিকে ধরিয়াছিল, পোষা পায়রা ধরিতে বিশেষ কষ্ট হয় নাই।

গোকুলদাস কুর্তার পকেট হইতে এক চিলতা কাগজ বাহির করিলেন। কাগজে লেখা ছিল—

প্রতাপ বারবটিয়া,

তোমার প্রণয়িনী পরপওয়ালীকে ধরে নিয়ে যাচ্ছি। যদি তার প্রাণ ও ধর্ম রক্ষা করতে চাও,
তবে কাল সূর্যোদয়ের আগে আমার দেউড়িতে এসে ধরা দাও। যদি ধরা না দাও, সূর্যোদয়ের পর
তোমার প্রণয়িনীকে আমার ভৃত্য কান্তিলালের হাতে সমর্পণ করা হবে।

—গোকুলদাস শেঠ

চিঠি কপোতের পায়ে বাঁধিয়া তাহাকে উড়াইয়া দেওয়া হইল। তারপর গোকুলদাস নিজ ডুলিতে প্রবেশ করিলেন। বলিলেন,

নে, জলদি ফিরে চল। দেখি এবার বারবটিয়া কোথায় যায়!

দুইটি ডুলি লইয়া দলবল আবার নিম্নাভিমুখে ফিরিয়া চলিল।

.

শৈলরেখাবন্ধুর পশ্চিম দিগন্তে অস্তরাগ লাগিয়াছে। গুহামুখে দাঁড়াইয়া প্রতাপ কপোতের পা হইতে চিঠি খুলিতেছে। আর সকলে তাহার চারিপাশে দাঁড়াইয়া আছে।

কপোতটিকে তিলুর হাতে দিয়া প্রতাপ সাগ্রহে চিঠি খুলিল। চিঠির সম্বোধন পড়িয়াই তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। চিঠি পড়া যখন শেষ হইল তখন তাহার মুখের সমস্ত রক্ত নামিয়া গিয়া মুখ মৃতের মত পার হইয়া গিয়াছে।

সকলেই তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়াছিল; নানাভাই বলিয়া উঠিল,

কী হল প্রতাপভাই?

প্রতাপের অবশ হস্ত হইতে চিঠিখানা মাটিতে খসিয়া পড়িল। সে উত্তর দিতে পারিল না, একটা প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া পড়িয়া দুহাতে মুখ ঢাকিল।

নানাভাই ভূপতিত চিঠিখানা তুলিয়া লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল, আর সকলে উদ্বিগ্নমুখে তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল।

.

দিবালোক প্রায় নিভিয়া গিয়াছে। রাত্রি ঘনাইয়া আসিতেছে, কৃষ্ণা প্রতিপদের চাঁদ এখনও উঠে নাই।

গুহার সম্মুখে মোতির রাস ধরিয়া দাঁড়াইয়া প্রতাপ। তাহার কোমরে দুটি পিস্তল, আর কোনও অস্ত্র নাই। সে সঙ্গীদের সম্বোধন করিয়া ধীরকণ্ঠে বলিতেছে,

আমি ধরা দিতে চললাম। আর বোধহয় আমাদের দেখা হবে না। তোমাদের উপদেশ দেবার মত কোনও কথাই এখন খুঁজে পাচ্ছি না—তোমরা পরামর্শ করে যা ভাল বোঝ, করো। আর আমার শেষ অনুরোধ, আমাদের উদ্ধার করবার জন্যে বৃথা রক্তপাত করো না। বিদায়।

প্রতাপ একে একে সকলকে আলিঙ্গন করিল, তিলুর মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্বাদ করিল, তারপর মোতির পৃষ্ঠে চড়িয়া অবলীয়মান আলোর মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

.

গোকুলদাসের প্রাসাদের নিম্নতলে একটি প্রকোষ্ঠে চিন্তা বন্দিনী রহিয়াছে। তাহার দুই হাত শৃঙ্খলিত, সে দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া শুষ্কচোখে শুন্যে চাহিয়া আছে। তাহার মাথার উপর প্রায় ছাদের কাছে একটি ক্ষুদ্র গরাদহীন গবাক্ষ; গবাক্ষপথে চাঁদের আলো ঘরে প্রবেশ করিয়াছে।

প্রকোষ্ঠের দৃঢ় লৌহদ্বারের বাহিরে কান্তিলাল ও আর একজন প্রহরী পাহারা দিতেছে। কান্তিলালের সর্বাঙ্গে জ্বরজনিত উত্তাপের অস্থিরতা। যেন খাঁচায় ইঁদুর ধরা পড়িয়াছে, আর ক্ষুধিত বিড়াল খাঁচার চারিপাশে পাক খাইতেছে।

.

উপলকঠিন প্রান্তরের উপর দিয়া প্রতাপ মোতির পৃষ্ঠে ছুটিয়া চলিয়াছে; পাথরের উপর মোতির ক্ষুরধ্বনি নাকাড়ার মত দ্রুতচ্ছন্দে বাজিতেছে। চাঁদের কিরণে দৃশ্যটি স্বপ্নময়। মোতির পিছনে দীর্ঘ ছায়া পড়িয়াছে।

.

গুহার মধ্যে চারিটি পুরুষ ও একটি নারী অগ্নি ঘিরিয়া নীরবে বসিয়া আছে। আজ রন্ধনের আয়োজন নাই, চটুল হাস্য পরিহাস নাই। তিলু একপ্রান্তে বসিয়া আছে, তাহার গণ্ড বহিয়া নিঃশব্দে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে।

পুরুষদের মধ্যে ভীমভাইয়ের অবস্থা সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয়। অন্য সকলে হতাশ গম্ভীর মুখে বসিয়া আছে কিন্তু ভীম যেন এই প্রচণ্ড আঘাতে একেবারে ভূমিসাৎ হইয়াছে। সে দুই জানু বাহুবদ্ধ করিয়া আগুনের দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে; তাহার মুখ দেখিয়া মনে হয় চিন্তা করিবার শক্তিও তাহার অবশ হইয়া গিয়াছে।

সহসা পুরন্দর মুখ তুলিল,–

এখানে থেকে আর লাভ কি?

প্রভু মাথা নাড়িল।

কোনও লাভ নেইই। তার চেয়ে

নানাভাই বলিল,-তার চেয়ে প্রতাপ যেখানে ধরা দিতে গেছে সেই শহরে—

পুরন্দর বলিল,-কিন্তু প্রতাপভাই মানা করে গেছেন।

প্রভু বলিল,-রক্তপাত আমরা করব না। কিন্তু রক্তপাত না করেও ওদের উদ্ধারের চেষ্টা করা যেতে পারে।

নানা ও পুরন্দর সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। প্রভু ভীমের দিকে ফিরিয়া দেখিল তাহাদের কথা ভীমের কানে যায় নাই। প্রভু বলিল,-

ভীম, তুমি কি বল?

ভীম চমকিয়া উঠিল,

অ্যা। কী?

প্রভু বলিল,-আমরা শহরে যেতে চাই; প্রতাপের কাছাকাছি থাকলেও হয়তো তাকে সাহায্য করতে পারব। তিলুবেন, তুমি কি বল?

তিলু কথা বলিল না, কেবল ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল। ভীমের মুখভাব কিন্তু সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

শহরে! কিন্তু যদি কেউ আমাদের চিনতে পারে?

তিলু ও আর সকলে একটু অবাক হইয়া ভীমের পানে তাকাইল। প্রভু বলিল,-

প্রতাপের শহরে আমাদের কে চিনবে? আমরা কেউ ও শহরের লোক নই। তা ছাড়া আমরা গা-ঢাকা দিয়ে থাকব; সেখানে লছমন আছে, সে আমাদের লুকিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করবে।

ভীম যেন এখনও নিঃসংশয় হইতে পারে নাই, এমনিভাবে স্খলিতস্বরে বলিল,–

তা—তা—এখানেও তো আর নিরাপদ নয়—শহরে যদি—

.

সম্মুখদিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া প্রতাপ মোতির পৃষ্ঠে বসিয়া আছে; মোতি গিরিকান্তার পার হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহার মুখে ফেনা, সর্বাঙ্গে ঘাম ঝরিতেছে।

চন্দ্র মধ্যাকাশে। মোতির ছায়া তাহার পেটের নীচে পড়িয়াছে। প্রতাপ মোতির গ্রীবার উপর হাত রাখিয়া মাঝে মাঝে অস্ফুটস্বরে বলিতেছে,

মোতি, আরও জোরে চল্ বেটা—এখনও অর্ধেক পথ বাকি।

.

চিন্তার কারাকক্ষের দ্বারমুখে কান্তিলাল পায়চারি করিতে করিতে পাহারা দিতেছে, অন্য প্রহরীটা দাঁড়াইয়া ঝিমাইতেছে। দূরে কোতোয়ালীর ঘড়িতে মধ্যরাত্রির ঘন্টা বাজিল।

গোকুলদাসের চোখে নিদ্রা ছিল না, তিনি আসিয়া দেখা দিলেন। কান্তিলালকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

কি রে, আছে তো ছুঁড়ি?

কান্তিলাল নৃশংসহাস্যে দন্ত বাহির করিল।

যাবে কোথায় শেঠ? চাবি দাও, খুলে দেখিয়ে দিচ্ছি।

গোকুলদাস কোমর হইতে চাবি দিলেন, কান্তিলাল তালা খুলিয়া দ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত করিল। ফাঁক দিয়া উভয়ে দেখিলেন, চিন্তা দেয়ালে ঠেস দিয়া পূর্ববৎ বসিয়া আছে, একটু নড়েও নাই।

দ্বারে তালা লাগাইয়া গোকুলদাস আবার চাবি কোমরে ঝুলাইলেন।

বারবটিয়া যদি সূর্যোদয়ের আগে ধরা না দেয়—

কান্তিলালের চক্ষু লোভে জ্বলিয়া উঠিল, সে সৃক্কণী লেহন করিল।

.

মোতি চলিয়াছে। ফেনায় ঘর্মে তাহার সর্বাঙ্গ আপ্লুত। সম্মুখে পাহাড়ের একটা চড়াই। মোতি একটা নালা লাফাইয়া পার হইয়া গেল, তারপর চড়াই উঠিতে আরম্ভ করিল। ছায়া এখন তাহার সম্মুখে; সে যেন নিজের ছায়াকে ধরিবার জন্য ছুটিয়াছে।

প্রতাপ অস্ফুটস্বরে বলিল,–

আর একটু, আর একটু মোতি! এই পাহাড়টা পার হলেই—

.

পূর্বাকাশে একটুখানি আলোর ঝিলিক দেখা দিয়াছে, কিন্তু পৃথিবীপৃষ্ঠে এখনও তাহার প্রতিবিম্ব পড়ে নাই। পশ্চিম গগনে চন্দ্র প্রভাহীন।

মোতি এখন সমতল বালুময় ভূমি দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে; শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছিতে আর দেরি নাই।

কিন্তু সমস্ত রাত্রি অবিশ্রাম ছুটিবার পর মোতির বিপুল প্রাণশক্তিও নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। এতক্ষণ সে যন্ত্রবৎ ছুটিয়াছে, উচ্চনীচ উদ্ঘাত কিছুই তাহার গতিকে ব্যাহত

করিতে পারে নাই। কিন্তু এখন সহসা তাহার গতিবেগ প্রশমিত হইল, তাহার তীরের ন্যায় ঋজু-গতি এলোমেলো হইয়া গেল। তারপর ক্লান্ত পাগুলি দুমড়াইয়া মোতি মাটির উপর পড়িয়া গেল।

প্রতাপ ছিটাইয়া দূরে পড়িল। বালুর উপর তাহার আঘাত লাগিল না, সে দ্রুত উঠিয়া মোতির কাছে আসিয়া বুকভাঙা স্বরে ডাকিল,

মোতি!

মোতি আর উঠিল না। তাহার হৃৎস্পন্দন থামিয়া আসিতেছিল, সে বিকৃত নাসারন্ধ্র হইতে কয়েকটি অতি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। তারপর তাহার দেহ স্থির হইল।

প্রতাপ মোতির গ্রীবার উপর লুটাইয়া পড়িল,

মোতি—বেটা!

.

পূর্বাকাশ সিন্দুরবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে, সূর্যোদয়ের আর বিলম্ব নাই। পাখি ডাকিতেছে। গোকুলদাসের প্রাসাদভূমিতে বহু সেপাই সান্ত্রী; প্রতাপ বারবটিয়াকে ধরিবে বলিয়া সকলের সশস্ত্র ও সতর্কভাবে রাত কাটিয়াছে। ইহারা সকলেই গোকুলদাসের বেতনভুক।

হয়তো ইহাদের মধ্যে প্রতাপের দলভুক্ত দুই চারিটি লোক গুপ্তভাবে আছে, কিন্তু কাহারও আচরণ দেখিয়া তাহা সন্দেহ হয় না। তাহারা অন্য সকলের সহিত পাহারা দিয়াছে, হয়তো চিন্তাকে উদ্ধার করিবার উপায় খুঁজিয়াছে, কিন্তু আদেশদাতা নেতার অভাবে কিছুই করিতে পারে নাই।

চিন্তার অবরোধ কক্ষের সম্মুখের অলিন্দে দাঁড়াইয়া গোকুলদাস বাহিরের দিকে তাকাইয়া আছেন। তাঁহার ললাটে নিষ্ফল ক্রোধের ভ্রূকুটি।

চক্রবাল-রেখায় ধীরে ধীরে সূর্যোদয় হইল।

গোকুলদাস মনে মনে গর্জন করিলেন বারবটিয়া আসিল না। শয়তান ধরা দিল না। আচ্ছা, তবে রাজপুতনীটাই তাহার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

কান্তিলাল ও অন্য প্রহরীটা গোকুলদাসের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তিনি ফিরিয়া বলিলেন,-

কাহ্না, তুই কোতোয়ালীতে যা—কোতোয়ালকে ডেকে নিয়ে আয়! ববি যে আমি প্রতাপ বারবটিয়ার দলের একটা মেয়েকে ধরেছি শিগগির এসে তাকে গ্রেপ্তার করুক।

যো হুকুম।

কাহ্না চলিয়া গেলে কান্তিলাল ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল,–

শেঠ, আমার বকশিশ।

গোকুলদাস বিকৃতমুখে হাসিয়া চাবি তাহার হাতে দিলেন,

এই নে তোর বকশিশ।

অধৈর্য-স্খলিতহস্তে কান্তিলাল দ্বারের তালা খুলিল। দুহাতে দ্বার ঠেলিয়া যেই সে প্রবেশ করিতে যাইবে অমনি ভিতর হইতে পিস্তলের আওয়াজ হইল। কান্তিলালকে প্রবেশ করিতে হইল না, সে চৌকাঠের উপর মুখ খুঁজিয়া পড়িয়া গেল। গোকুলদাস চিৎকার করিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিলেন।

আওয়াজ শুনিয়া চারিদিক হইতে লোক ছুটিয়া আসিল, কিন্তু তাহারাও দরজার সম্মুখে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। কারাকক্ষের মধ্যে প্রতাপ ও চিন্তা পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছে; প্রতাপের দুই হাতে দুটি পিস্তল।

প্রতাপ বলিল,-আমরা তোমাদের হাতে ধরা দেব না। কোতোয়ালের হাতে আমরা ধরা দেব। তফাত থাকো—এগিয়েছ কি মরেছ।

সমবেত সান্ত্রীরা প্রতাপের উগ্রমূর্তি দেখিল, তাহার হাতের পিস্তল দেখিল, কান্তিলালের মৃতদেহ দেখিল, তারপর পিছু হটিল।

এই সময় সদলবলে কোতোয়াল আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিল। তিনি দ্বারের সম্মুখস্থ হইতেই প্রতাপ পিস্তল দুটি তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া শান্তকণ্ঠে কহিল,

আমি প্রতাপ বারবটিয়া, ইনি আমার স্ত্রী চিন্তাবাঈ। আমাদের বন্দী করুন।

৪

দুই দিন গত হইয়াছে।

বেলা দ্বিপ্রহর। শহরের পথে লোকারণ্য। সকলেই যেন একটা কিছুর প্রতীক্ষা করিতেছে। এই জনতার মধ্যে একস্থানে নানাভাইকে দেখা গেল, বহিরাগত গ্রাম্য-দর্শকের মত সে কৌতূহলভরে এদিক-ওদিক তাকাইতেছে। অন্যত্র একটি পানের দোকানের পাশে ভীমভাই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার চোখে দুঃস্বপ্ন দেখার বিভীষিকা। ইহাদের দেখিয়া অনুমান হয়, প্রতাপের দল শহরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

সহসা জনতার চাঞ্চল্য স্তব্ধ হইল। সকলে দেখিল, একদল সিপাহী কুচকাওয়াজ করিয়া আসিতেছে; তাহাদের পিছনে একটি অশ্ববাহিত শকট। শকটের পিছনে আবার একদল সিপাহী।

শকটের আকৃতি বাঘের খাঁচার মত, উপরের ছাদ ও চারিদিক মোটা মোটা লোহার গরাদ দিয়া ঘেরা। এই শকটের মধ্যে চিন্তা ও প্রতাপ দাঁড়াইয়া আছে; তাহাদের বাহু পরস্পর শৃঙ্খল দিয়া বদ্ধ।

জনসঙ্ঘ ক্ষুব্ধমুখে বিদ্রোহভরা চোখে দেখিতে লাগিল। সেনা রক্ষিত কারাগারের শকট বন্দীদের লইয়া চলিয়া গেল।

নানাভাই গ্রামিক-সুলভ সরলতায় পাশের একটি নাগরিককে জিজ্ঞাসা করিল,

বাবুজী, ওদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

নাগরিক তিক্তস্বরে বলিল,–

আদালতে। সাহুকারেরা আইন ভঙ্গ করবে না, রীতিমত বিচার করে ওদের ফাঁসি দেবে।

.

বিচারভবনের সম্মুখের বিস্তৃত মাঠে বিপুল জনতা সমবেত হইয়াছে। কোতোয়ালীর অগণ্য সিপাহী বিচারগৃহ রক্ষা করিতেছে। মাঝে মাঝে জনতরঙ্গ বিচারগৃহের দিকে ঝুঁকিতেছে আবার সিপাহীদের দ্বারা প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে। ইহারা বিদ্রোহী নয়, উত্তেজিত নাগরিক জনমণ্ডলী; ইহারা কেবল দেখিতে চায় শুনিতে চায় কীভাবে প্রতাপ বারবটিয়ার বিচার হইতেছে।

বিচারগৃহের মধ্যেও তিল ফেলিবার ঠাঁই নাই। গোকুলদাস প্রমুখ মহাজনগণ আগে হইতেই বিচারকক্ষ জুড়িয়া বসিয়াছেন। বিচারকের আসন যিনি অলঙ্কৃত করিয়াছেন তিনি একটি শীর্ণকায় তির্যকচক্ষু বৃদ্ধ, শেঠগণের দিকে একচক্ষু রাখিয়া তিনি বিচারের অভিনয় করিতেছেন। তিনি জানেন, আসামীদের ফাঁসির হুকুম তাঁহাকে দিতেই হইবে; অথচ

দেশের বিপুল জনমত কাহার প্রতি সহানুভূতিশীল তাহাও তাঁহার অজ্ঞাত নহে। তাই বিচারাসনে বসিয়া তাঁহার ক্ষীণ-দেহ থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।

আসামীর কাঠগড়ায় প্রতাপ ও চিন্তা পাশাপাশি দাঁড়াইয়া। বিচারের অভিনয় দেখিয়া প্রতাপের মুখে মাঝে মাঝে চকিতে বিদ্রূপের হাসি খেলিয়া যাইতেছে।

.

শহরের দরিদ্র-অঞ্চলে একটি জীর্ণ কুটির। ইহা লছমনের বাসস্থান; সম্প্রতি প্রতাপের দস্যুদল এই গৃহেই আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে।

কুটিরের দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ; কিন্তু পাশের একটি ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ জানালায় দাঁড়াইয়া তিলু উৎকণ্ঠিতভাবে বাহিরের পানে তাকাইয়া আছে।

এই সময় বৃদ্ধ লছমনকে আসিতে দেখা গেল। তিলু তাহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া দিল।

কী খবর লছমনভাই?

লছমনের ক্লান্ত দেহ যষ্টি নুইয়া পড়িতেছিল; সে দরজা ভেজাইয়া দিয়া ঘরের মধ্যস্থলে মেঝের উপর বসিয়া পড়িল। ঘরের এককোণে কেবল ভীম জানু বাহুবদ্ধ করিয়া বসিয়াছিল, সে মুখ তুলিয়া চাহিল।

তিলু লছমনের সম্মুখে বসিয়া ব্যগ্রস্বরে আবার প্রশ্ন করিল,-

লছমনভাই, কিছু খবর পেলে?

লছমন বলিল,—কী আর খবর পাব বেন? আমি বুড়োমানুষ, ভিড়ের মধ্যে তো ঢুকতে পারিনি, বাইরে থেকে যেটুকু খবর পেলাম—

কী খবর পেলে?

শয়তানেরা শুধু প্রতাপ আর চিন্তাকে ধরেই সন্তুষ্ট নয়, দলের আর সবাইকে ধরতে চায়।

ভীমভাই উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল।

তিলু সংহতকণ্ঠে বলিল,-তারপর?

লছমন বলিল,-প্রতাপকে হাকিম হুকুম করেছিল—তোমাদের দলে কে কে লোক আছে তাদের নাম কর। প্রতাপ তার মুখের মত জবাব দিয়েছে, বলেছে কত নাম করব,

দেশের সমস্ত লোক আমার দলে। বাইরে জনসমুদ্রের গর্জন শুনতে পাচ্ছ না? ওরা সব আমার দলে। আজ শুধু ওদের গর্জন শুনছ, একদিন ওরাই বন্যা হয়ে তোমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

বলিতে বলিতে লছমনের নিষ্প্রভ চক্ষু চকচক করিয়া উঠিল, তিলু রুদ্ধ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। ভীমভাইয়ের মুখে কিন্তু কোনই প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না, সে যেন কিছুই ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই, এমনিভাবে ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল।

.

ওদিকে আদালতের সম্মুখে অসংখ্য নরমুণ্ড পূর্ববৎ ভিড় করিয়া আছে।

বিচারকক্ষের অলিন্দে একজন তকমা-পরা রাজপুরুষ দেখা দিল। সে হাত তুলিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল,-

প্রতাপ বারবটিয়ার বিচার আজ মুলতুবি রইল। কাল আবার বিচার হবে এবং রায় বেরুবে।

জনতা সংক্ষুব্ধ হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

.

কুটিরের কক্ষে তিলু ভীমভাইয়ের পাশে দাঁড়াইয়া তাহার কাঁধে নাড়া দিতেছিল আর বলিতেছিল—

কী হয়েছে তোমার? সবাই বাইরে গেছেন আর তুমি ঘরে বসে আছ? প্রতাপভাইয়ের এই বিপদে তোমার কি কিছুই করবার নেই?

ভীমভাই বলিল,-কি করব?

তিলু বলিল,-কি করবে তা কি আমি মেয়েমানুষ তোমাকে বলে দেব? মরদ হয়ে তুমি এমন ভেঙে পড়েছ ছি ছি ছি

বিরক্ত করো না—আমাকে আর বিরক্ত করো না। বলিয়া ভীমভাই জানুর মধ্যে মুখ গুজিল।

এই সময়ে নানাভাই, প্রভু ও পুরন্দর ফিরিয়া আসিল। সকলেরই মুখ গম্ভীর বিষণ্ণ। নানাভাই লছমনের কাছে বসিয়া সনিশ্বাসে বলিল,-

ওদের ছাড়বে না সাহুকারেরা–ফাঁসি দেবে।

প্রভু বলিল,-আজ মোকদ্দমা মুলতুবি রাখবার কারণ কি জানো? ওদের ভয় হয়েছে, ফাঁসির হুকুম দেবার পর বেশী দিন দেরি করলে দেশের লোক ক্ষেপে গিয়ে প্রতাপকে জোর করে ওদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেবে। তাই কাল ফাঁসির রায় দেবে আর সঙ্গে সঙ্গে ফাঁসি দেবে। আজ রাত্রেই ওরা ফাঁসির আয়োজন ঠিক করে রাখবে, তারপর শহরের লোক তৈরি হবার আগেই কাজ শেষ করে ফেলবে।

ভীমভাই তড়িৎপৃষ্ঠের মত উঠিয়া দাঁড়াইল; তাহার দুই চোখ যেন ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে।

কাল ফাঁসি দেবে? কাল?

পুরন্দর বলিল,-আমারও তাই মনে হয়। ফেরবার সময় দেখলাম, গরুর গাড়ি বোঝাই করা বড় বড় তক্তা আর শালের খুটি নিয়ে গিয়ে আদালতের সামনে মাঠে ফেলছে—বোধ হয় ঐখানেই ফাঁসির মঞ্চ খাড়া করবে।

ভীমভাইয়ের কণ্ঠ হইতে একটা অবরুদ্ধ শব্দ বাহির হইল। সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। তিলু চেঁচাইয়া উঠিল,

কোথায় যাচ্ছ তুমি?

এখানে আর নয় বাইরে। শহরের বাইরে— বলিতে বলিতে ভীম দ্বারের বাহিরে অদৃশ্য হইল। সকলে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। প্রতাপ-চিন্তা ধরা পড়িবার পর হইতে ভীমভাইয়ের অদ্ভুত আচরণে সকলের মনেই খটকা লাগিয়াছিল, তবু ভীমভাইকে প্রাণভয়ে ভীত কাপুরুষ মনে করিতে সকলেরই মনে সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল। কিন্তু এখন আর কাহারও সন্দেহ রহিল না। সকলে লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া রহিল। তিলু মুখে আঁচল ঢাকা দিয়া কাঁদিয়া উঠিল,-

ছি ছি ছি—আমার অদৃষ্টে এই ছিল। কাপুরুষ—আমার স্বামী কাপুরুষ

.

আদালতের সম্মুখস্থ ময়দানে ছুতারমিস্ত্রিরা কাজ করিতেছে; তক্তা ও খুঁটির সাহায্যে একটি চতুষ্কোণ-মঞ্চ গড়িয়া উঠিতেছে। মঞ্চটি দুই হাত উচ্চ, লম্বায়-চওড়ায় প্রায় দশ হাত। মঞ্চের মধ্যস্থলে দুইটি মজবুত খুটি খাড়া করিবার চেষ্টা হইতেছে।

ছুতারদের হাতুড়ির ঠকাঠক্ আওয়াজ বহুদূর পর্যন্ত সঞ্চারিত হইতেছে।

ময়দানের প্রান্তে দাঁড়াইয়া একটি গাছের আড়াল হইতে ভীমভাই এই দৃশ্য দেখিল, তারপর পিছু ফিরিয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিল।

.

সন্ধ্যা হয় হয়। শহরের উপকণ্ঠে রাজপথের পাশে একটি অর্ধশুষ্ক পল্বল। একদল ধোপা এই পল্বলে কাপড় কাচিতেছে। পথিপার্শ্বস্থ তরুমূলে তাহাদের গর্দভগুলি একটি বৃক্ষকাণ্ডে হেলান দিয়া দণ্ডায়মান অবস্থায় নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছে।

শহরের দিক হইতে ভীমভাইকে আসিতে দেখা গেল। সে এখনও দৌড়াইতেছে, কিন্তু তাহার গতি তেমন দ্রুত নয়।

গর্দভদের নিকটবর্তী হইয়া ভীমভাই থামিল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল রজকেরা আপনমনে কাপড় কাচিতেছে। সে তখন পথ হইতে একটি কঞ্চি তুলিয়া লইয়া সন্তর্পণে একটি গাধার নিকটবর্তী হইল।

নিদ্রালু গাধাটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট। ভীমভাই বিনা আয়াসে তাহার পিঠে উঠিয়া বসিল। গাধা আপত্তি করিল না। ভীমভাই তাহার পশ্চাদ্দেশে কঞ্চির আঘাত করিতেই গাধা দুলকি চালে চলিতে আরম্ভ করিল।

ধোপারা কিছুই লক্ষ্য করিল না।

.

পরদিন মধ্যাহ্ন। বিচারগৃহের সম্মুখে তেমনি বিপুল জনসমাগম হইয়াছে। আজ সরকারী প্রহরীর সংখ্যা অনেক বেশী; ফৌজী কুর্তাপরা বন্দুকধারী সান্ত্রীর দল বিচারগৃহটিকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে।

যে মঞ্চটি কাল প্রস্তুত হইতে দেখা গিয়াছিল তাহা যে সত্যই ফাঁসির মঞ্চ তাহাতে সন্দেহ নাই। মঞ্চের উপর যুগল খুঁটির শীর্ষে আড়া লাগিয়াছে, আড়া হইতে পাশাপাশি দুইটি দড়ি ঝুলিতেছে। একজন যমদূতাকৃতি ঘাতক মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া দড়ি দুটিকে টানিয়া-টানিয়া তাহাদের ভারসহন ক্ষমতা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে।

কিন্তু পরিহাস এই যে বিচার এখনও শেষ হয় নাই। বিচারকক্ষে হাকিম মহোদয় রায় দিবার পূর্বে বিলক্ষণ বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। কখনও নথিপত্র উল্টাইয়া দেখিতেছেন, কখনও কলম লইয়া কাগজে কিছু লিখিতেছেন। মামলার সমস্ত কার্য শেষ হইয়াছে, এখন কেবল দণ্ডাদেশ দেওয়া বাকি। ঘরসুদ্ধ লোক রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করিয়া আছে। আসামীর কাঠগড়ায় প্রতাপ ও চিন্তা নির্লিপ্ত মুখে দাঁড়াইয়া। হাকিমের আদেশ কি হইবে তাহা তাহারা জানে, তাই সে বিষয়ে তাহাদের কোনও ঔৎসুক্য নাই।

অবশেষে বিচারক মহাশয় প্রতাপ ও চিন্তার প্রতি তির্যক-দৃষ্টিপাত করিয়া গলাখাঁকারি দিলেন,

প্রতাপ বারবটিয়া, চিন্তা পানিহারিন, গুরুতর অভিযোগে তোমাদের বিচার হয়েছে—তোমরা রাজদ্রোহিতা এবং নরহত্যার অপরাধে অভিযুক্ত। বিচারে তোমাদের অপরাধ

সম্পূর্ণ প্রমাণিত হয়েছে। আমি তাই ধর্মাসনে বসে দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করছি—তোমাদের শাস্তি প্রাণদণ্ড।

.

নগরের উপকণ্ঠে একদল অশ্বারোহী-সৈনিক অতিদ্রুত ছুটিয়া আসিতেছে। তাহারা কে, লক্ষ্য করিবার পূর্বেই ক্ষুরোদ্ধৃত ধূলিতে চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া তাহারা চলিয়া গেল।

.

বিচারালয়ের সম্মুখে মঞ্চ ঘিরিয়া জনসমুদ্র আবর্তিত হইতেছে। এই জনাবর্তে নানাভাই আছে, প্রভু পুরন্দর আছে, লছমন ও তিলু আছে; তাহারা ঘুর্ণিচক্রের উপর খড়কুটার মত মঞ্চের আশপাশে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। তিন সারি সিপাহী মঞ্চকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং ঘূর্ণমান জনতাকে মঞ্চ হইতে পৃথক রাখিয়াছে।

কোতোয়ালের অধীনে একদল বন্দুক-কিরিচধারী সান্ত্রী বিচারকক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিল; তাহাদের মধ্যস্থলে চিন্তা ও প্রতাপ। তাহারা সদলবলে জনতাকে বিভিন্ন করিয়া মঞ্চের নিকট উপস্থিত হইল। কোতোয়াল প্রতাপ ও চিন্তাকে লইয়া মঞ্চের উপর উঠিলেন—আর সকলে নীচে রহিল।

আবর্তনশীল জনতা সহসা নিশ্চল ঊর্ধ্বমুখে মঞ্চের পানে চাহিয়া রহিল। সমস্ত জনসঙ্ঘের মিলিত নিশ্বাসে একটা মর্মরধ্বনি উঠিল।

তিলু মঞ্চের কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল; প্রতাপ ও চিন্তাকে ফাঁসির মঞ্চের উপর দেখিয়া তাহার আত্মগোপনের প্রবৃত্তি আর রহিল না, সে কাঁদিয়া ডাকিল,

প্রতাপভাই। চিন্তাবেন।

তিলুকে দেখিয়া প্রতাপ ও চিন্তার মুখে কোমল স্নেহার্দ্র হাসি ফুটিয়া উঠিল; তাহারা অন্যান্য সঙ্গীদের দেখিবার আশায় জনতার মধ্যে চারিদিকে চক্ষু ফিরাইল। নানা, প্রভু, লছমন ও পুরন্দরের সঙ্গে চোখাচোখি হইল। চোখের ইশারায় সকলে বিদায় লইল।

ইতিমধ্যে জনতা সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছিল। সজ্ঞান কোনও চেষ্টা না থাকিলেও জোয়ারের তরঙ্গের মত জনতার উচ্ছাস মঞ্চের প্রান্ত পর্যন্ত আসিয়া পড়িতেছিল, আবার প্রহরীদের বাধা পাইয়া পিছু হটিতেছিল। দেখিয়া কোতোয়াল মহাশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। বিলম্ব করিলে অনর্থ ঘটিতে পারে। তিনি জল্লাদকে ইঙ্গিত করিলেন।

প্রতাপ ও চিন্তার গলায় জল্লাদ দড়ির ফাঁস পরাইল। জনারণ্য নিশ্বাস লইতে ভুলিয়া গেল, কেবল সহস্রচক্ষু হইয়া চাহিয়া রহিল।

সহসা বিশাল জনসঙ্ঘের রুদ্ধশ্বাস নীরবতা বিদীর্ণ করিয়া ঘোর তুর্যধ্বনি হইল। সকলে চমকিয়া দেখিল, একদল অশ্বারোহী সিপাহী জনব্যূহ ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেছে, তাহাদের অগ্রে সর্দার তেজ সিং ও ভীমভাই।

তেজ সিং ও ভীম ঘোড়া হইতে লাফাইয়া মঞ্চের উপর উঠিলেন। ভীম কোনও দিকে দৃকপাত না করিয়া ছুটিয়া গিয়া প্রতাপকে জড়াইয়া ধরিল।

ওদিকে তিলু মঞ্চের নিম্নে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে মঞ্চের উপর উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল, তেজ সিং চিনিতে পারিয়া তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিয়া লইলেন। তিলু দরবিগলিত নেত্রে গিয়া চিন্তার কণ্ঠলগ্না হইল।

তেজ সিংয়ের হাতে একখণ্ড কাগজ ছিল; সেই কাগজ উর্ধ্বে আন্দোলিত করিয়া তিনি জনতাকে সম্বোধন করিলেন,

আমি সর্দার তেজ সিং রাজার পরোয়ানা এনেছি। আমাদের মহানুভব রাজা চিন্তাবাঈ এবং প্রতাপ সিংয়ের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে তাদের মুক্তি দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, এই পরোয়ানার দ্বারা মহামহিম রাজা সর্দার প্রতাপ সিংকে তাঁর রাজ্যের প্রধান কোতোয়াল নিযুক্ত করেছেন। আজ থেকে এ রাজ্যের রাজশক্তি এবং প্রজাশক্তির মিলন হল। যিনি প্রজার পরম বন্ধু ছিলেন, তিনি রাজার প্রতিভূ হলেন; যিনি এতদিন গোপনে গোপনে অসহায়কে সাহায্য করেছেন, দরিদ্রকে ধনীর উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করেছেন,

তিনি আজ প্রকাশ্যে রাজার দক্ষিণহস্তস্বরূপ হয়ে সেই মহাকর্তব্য পালন করবেন। আজ থেকে আমাদের নবজীবনের আরম্ভ হল। জয় হোক—সর্দার প্রতাপ সিংয়ের জয় হোক।

বিরাট জয়ধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ হইয়া গেল। প্রতাপ ও চিন্তা তেজ সিংয়ের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা যুক্তকরে গণদেবতাকে অভিবাদন করিল।

উপসংহারে দেখা গেল, তিলু ও ভীমভাই ফাঁসির রজ্জুদুটির প্রান্ত একত্র করিয়া গ্রন্থি দিয়া উহাকে ঝুলায় পরিণত করিয়াছে এবং তাহার উপর বসিয়া পরমানন্দে দোল খাইতেছে।